শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ঝুড়ি কুড়ি গল্প

বিজ্ঞান থেকে রহস্য, গোয়েন্দা থেকে ভূত,
মজা থেকে মর্মস্পর্শী গল্প...ছোটদের
জন্যে সবরকমের লেখাতেই যিনি
অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তিনি আর কেউ নন,
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়।
বিভিন্ন পত্রিকায় গত ১০ বছরে লেখা
অনবদ্য একঝুড়ি কুড়িটা গল্প নিয়েই
এই বই।
**গণেশের মূর্তি, দীপুর অঙ্ক, সময়সরণি,
উল্কা ও ষষ্ঠীচরণ, অনুসরণকারী, আগন্তুক**
থেকে **কেনারাম, গয়ানাথের হাতি,
নফরগঞ্জের রাস্তা** বা **যতীনবাবুর চারহাত,
কানাই সামন্তর দোকান, পরাণের ঘোড়া,
ছায়ার লড়াই, ওয়ারিশান**...এমনই বৈচিত্র্যে
ভরপুর সব গপ্পো। কখনও হাসি, কখনও
শিহরণ কখনও বা কষ্টে বুক উপছে ওঠে।

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

ঝুড়ি কুড়ি গল্প

পত্র ভারতী

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১৩

JHURI KURI GOLPO
Short Stories
by
Shirsendu Mukhopadhyay

ISBN 978-81-8374-181-1

প্রচ্ছদ
রোচিষ্ণু সান্যাল
অলংকরণ
সুদীপ্ত মণ্ডল

মূল্য
১৫০.০০

Publisher
PATRA BHARATI
3/1 College Row, Kolkata 700 009
Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799
e-mail : patrabharati@gmail.com www.bookspatrabharati.com
Price ₹ 150.00

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

‘রা-স্বা’

বন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রম

স্নেহের শ্রীমান্ টিনাকে

সূ চি প ত্র

গণেশের মূর্তি ৯
দীপুর অঙ্ক ১৭
সময় সরণী ২৭
উল্কা ও ষষ্ঠীচরণ ৩৭
অনুসরণকারী ৪৯
আগন্তুক ৫৭
একান্ন টাকা ৬৫
চকবেড়ের গোহাটায় ৭৫
রাতের অতিথি ৮৫
কবচ ৯৩
ওয়ারিশান ১০১
যতীনবাবুর চার হাত ১১১
কানাই সামন্তর দোকান ১১৭
নফরগঞ্জের রাস্তা ১২৭
গয়ানাথের হাতি ১৩৭
রুণু ১৪৭
কেনারাম ১৫৫
পরাণের ঘোড়া ১৬১
ছায়ার লড়াই ১৬৯
বশীকরণ ১৭৫

পত্র ভারতী প্রকাশিত
লেখকের অন্যান্য বই

ভ্রমণ সমগ্র

বিন্দু থেকে সিন্ধু

শীর্ষেন্দুর সেরা ১০১

পাঁচটি উপন্যাস

ময়নাগড়ের বৃত্তান্ত

ভৌতিক গল্পসমগ্র

ঝুড়ি কুড়ি গল্প

গণেশের মূর্তি

মহাদেববাবু মানুষটি বড় ভালো। দোষের মধ্যে তিনি গরিব। নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। আর সেইজন্যে বাড়িতে তাঁকে যথেষ্ট গঞ্জনা সহ্য করতে হয়। তাঁর স্ত্রী মনে করেন ভালোমানুষির জন্যই মহাদেববাবু কোনও উন্নতি করতে পারলেন না। একটা দোকানে সামান্য কর্মচারীর কাজ করেন তিনি। সামান্য যা পান তা থেকেও গরিব-দুঃখীকে সাহায্য করেন। কেউ ধারটার করলে শোধ চাইতে পারেন না। দুষ্টু লোকেরা তাঁকে ঠকানোরও চেষ্টা করে। মহাদেববাবু ভালোই জানেন, এ জীবনে তিনি আর উন্নতি করেত পারবেনও না। তাঁর সেইজন্য তেমন দুঃখও নেই। তবে ছেলেপুলেরা খাওয়াদাওয়ার কষ্ট পেলে তাঁর খুব দুঃখ হয়। বেশি পয়সার লোভ তাঁর নেই। তবে আর সামান্য কিছু বেশি টাকা যদি রোজগার করতে পারতেন তা হলেই হত।

একদিন কাজকর্ম সেরে রাত্রিবেলা মহাদেববাবু বাড়ি ফিরছেন। পথে একটা মস্ত বটগাছ পড়ে। এই বটতলায় মাঝে মাঝে এক আধজন সাধু এসে কয়েকদিন ধুনি জ্বালিয়ে থানা গেড়ে বসে। ধর্মভীরু মহাদেববাবু সাধু-সজ্জন দেখলেই সিকিটা আধুলিটা যাই হোক প্রণামি দিয়ে প্রণাম করে যান।

আজ দেখলেন বটতলায় বিরাট চেহারার এক প্রাচীন সাধু ধুনি জ্বালিয়ে বসে আছেন। তাঁর বিশাল জটা আর দাড়ি-গোঁফ। মহাদেববাবু চটি ছেড়ে ভক্তিভরে একখানা সিকি প্রণামি দিয়ে

প্রণাম করলেন।

সাধু তাঁর দিকে চেয়ে হঠাৎ বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, কী চাস তুই?

মহাদেববাবু মাথা নেড়ে বললেন, কিছু না বাবা।

সাধুরা সর্বত্যাগী, তাঁদের কাছে কিছু চাইতে মহাদেববাবুর লজ্জা করে।

সাধু তাঁর দিকে চেয়ে গম্ভীর গলায় বললেন, কিছুই চাস না?

না বাবা, আপনার কাছে কেন চাইব? আপনি নিজেই তো সবকিছু ত্যাগ করে এসেছেন।

সাধুর মুখভাব দেখে মনের ভাব বোঝার উপায় নেই। দুই জ্বলজ্বলে চোখে কিছুক্ষণ মহাদেববাবুর মুখের দিকে চেয়ে থেকে হঠাৎ পাশে রাখা একটা ঝোলা থেকে একটা ছোটো গণেশমূর্তি বের করে বললেন, এটা নিয়ে যা।

মহাদেব মূর্তিটা ভক্তিভরে নিয়ে কপালে ঠেকালেন। পেতলের তৈরি ছোট সুন্দর একখানা মূর্তি।

সাধু বললেন, মাথার কাছে রেখে রাতে শুবি।

যে আজ্ঞে। কিন্তু বাবা, আমার তো আর পয়সা নেই, এর দাম দেব কী করে?

কে কার দাম দিতে পারে রে ব্যাটা! দাম দেওয়া কি সোজা! যা, বাড়ি যা।

ভারি যত্ন করে মূর্তিটা নিয়ে বাড়ি ফিরলেন মহাদেব। তাঁর বিছানার কাছে শিয়রে একটা কুলুঙ্গিতে মূর্তিটা রেখে রাতে শুলেন।

ঘুমিয়ে আছেন, হঠাৎ মাঝরাতে টুক করে কি যেন একটা তাঁর পেটের ওপর পড়ল। তিনি চমকে জেগে উঠে জিনিসটা হাতড়ে নিয়ে আলো জেলে দেখলেন, একটা কাঁচা টাকা। তিনি হাঁ করে চেয়ে রইলেন। টাকাটা কোত্থেকে এল তা আকাশ-পাতাল ভেবেও বুঝতে পারলেন না।

পরদিন কাজে যাওয়ার সময় তিনি বটতলার সাধুটিকে আর দেখতে পেলেন না। শুধু ধুনির ছাই পড়ে আছে। সাধুজি চলে গেছেন। ইচ্ছে ছিল, আজ একটা টাকা প্রণামি দিয়ে যাবেন, তা আর হল না।

সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর রাত্রিবেলা ফিরে খেয়েদেয়ে ঘুমোলেন মহাদেববাবু। আর কী আশ্চর্য! আজও মধ্যরাতে তাঁর পেটের ওপর আগের রাতের মতোই একটা কাঁচা টাকা কোথা থেকে যেন এসে পড়ল। ঘুম ভেঙে মহাদেববাবু অবাক হয়ে বসে রইলেন। এটা কী হচ্ছে? এ কি গণেশঠাকুরের মহিমা? তিনি গণেশমূর্তিকে একটা প্রণাম করে বললেন, ঠাকুর, তোমার কত দয়া!

তা রোজই এইভাবে একটা করে টাকা পেতে লাগলেন মহাবেদবাবু।

মাসান্তে তাঁর ত্রিশটি টাকা অতিরিক্ত আয় হল। তাতে সংসারেরও সামান্য উন্নতি হল। মহাদেববাবু ত্রিশ টাকা থেকে পাঁচটি টাকা জমিয়ে ফেললেন। টানাটানির সংসারে এতকাল একটি পয়সাও সঞ্চয় হত না।

গণেশবাবার পয়েই যে এ কাণ্ড ঘটছে তাতে তাঁর আর সন্দেহ রইল না। সাধুবাবা তাঁকে কী আশ্চর্য জিনিসটা না দিয়ে গেলেন।

কৃতজ্ঞতায় রোজ তাঁর চোখে জল আসে।

বছর ঘুরল। ক্রমে ক্রমে মহাদেববাবুর অভাবের সংসারে একটু করে লক্ষ্মীশ্রীও ফিরছে। অল্প অল্প করে টাকাও জমছে। মহাদেববাবু তাতেই খুশি। তাঁর বেশি লোভ নেই।

মহাদেবের এই সামান্য বৈষয়িক উন্নতিও দু-একজনের চোখে পড়ল। তাদের মধ্যে একজন হলেন, উলটোদিকের বাড়ির মদন চৌধুরি। মদন পয়সাওয়ালা লোক, তবে খুব হিসেবি। সবাই জানে তিনি হাড় কেপ্পন।

একদিন মদনবাবু এসে মহাদেবের সঙ্গে আলাপ জমালেন। নানা কথায় ধীরে ধীরে মহাদেবের বৈষয়িক উন্নতির প্রসঙ্গও এল।

মদন জিগ্যেস করলেন, তা মহাদেব, তোমার মহাজন কি তোমার বেতন-টেতন বাড়িয়ে দিয়েছে নাকি?

আজ্ঞে না মদনদা।

তাহলে তোমার মুখখানায় যে আজকাল হাসি-খুশি ভাব দেখছি। বউমাও তো তেমন গঞ্জনা দিচ্ছেন না তোমাকে? বলি ব্যাপারখানা কী?

মহাদেববাবু অতি সরল মানুষ। তিনি অকপটে সরলভাবে গণেশমূর্তির ইতিবৃত্তান্ত সব মদন চৌধুরিকে বলে ফেললেন।

মদন চৌধুরির চোখ লোভে চকচক করতে লাগল। বললেন, বাপু হে, তুমি তো মস্ত আহাম্মক দেখছি। গণেশবাবার কাছে বেশি করে চেয়ে নাও না কেন? মোটে একখানা করে টাকা— ওতে কী হয়?

মহাদেববাবু মাথা নেড়ে বললেন, না দাদা, উনি খুশি হয়ে দিচ্ছেন, এই ঢের। তার বেশি আমার দরকার নেই।

মদন চৌধুরি খুব চিন্তিত মুখে উঠে চলে গেলেন।

তিন-চার দিন পরে মহাদেববাবু একদিন কাজকর্ম সেরে বাড়ি ফিরে ফল-জল দিতে গিয়ে দেখেন, কুলুঙ্গিতে গণেশমূর্তিটি নেই। মহাদেববাবুর মাথায় বজ্রাঘাত। সারা বাড়ি তন্নতন্ন করে খুঁজেও গণেশমূর্তি পাওয়া গেল না। মহাদেববাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে রইলেন, তাঁর দু-চোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মহাদেববাবু মনে মনে বললেন, এত সুখ তো আমার কপালে সওয়ার নয়।

ওদিকে মদন চৌধুরির আহ্লাদ আর ধরে না। মাথার কাছে তাকের ওপর গণেশমূর্তি নিয়ে শুয়ে প্রথম রাতেই তিনিও একখানি কাঁচা টাকা পেয়ে গেলেন।

সকালবেলা তিনি গণেশমূর্তিকে প্রণাম করে বললেন, মহাদেবটা আহাম্মক বাবা। ও তোমার মহিমা কী বুঝবে? ও রোজ একটা করে বাতাসা ভোগ দিত, সেইজন্যই তো দুপুরবেলা চুপিচুপি আমি তোমাকে চুরি করে এনেছি। ও-বাড়িতে তোমার যত্ন হচ্ছিল না। তোমাকে রোজ আমি সন্দেশ ভোগ দেব। টাকাটা দয়া করে পাঁচগুণ করে দাও।

তাই হল। পরের রাতে পর পর পাঁচটি কাঁচা টাকা এসে পড়ল মদন চৌধুরির পেটের ওপর। তিনি আহ্লাদে ডগোমগো। গণেশ তাঁর কথা শুনেছেন। সকালবেলায় তিনি গণেশকে প্রণাম করে বললেন, তোমার হাত খুলে গেছে বাবা। তাহলে টাকাটা এবার পঞ্চাশগুণ হোক।

তাই হল। মাঝরাতে বৃষ্টির মতো তাঁর পেটের ওপর মোট আড়াইশো কাঁচা টাকা পড়ল। তাতে মদন চৌধুরির পেটে বেশ

ব্যাথাও লাগল। কিন্তু টাকা পেয়ে আহ্লাদে তাঁর ব্যথার কথা মনেই রইল না। সকালে তিনি গণেশবাবাকে প্রণাম করে বললেন, বাবা, দয়াই যদি করলে তাহলে টাকাটা এবার হাজার গুণ করে দাও।

রাত্রিবেলা যা ঘটল তার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না মদন চৌধুরি। মধ্যরাতে হঠাৎ যখন তাঁর পেটের ওপর টাকা পড়তে শুরু করল তখন তিনি আহ্লাদে উঠে বসলেন। ওপর থেকে টং টং টং করে টাকা পড়তে লাগল মাথায়, গায়ে, হাতে, পায়ে। আড়াই লাখ টাকার বৃষ্টি যখন শেষ হল তখন মদন চৌধুরির মাথা ফেটে রক্ত বেরোচ্ছে, শরীরের নানা জায়গায় ক্ষত সৃষ্টি হয়েছে। তিনি অজ্ঞান হয়ে বিছানায় পড়ে রইলেন। টাকার স্তূপে সম্পূর্ণ ঢাকা।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন শরীরে একশো ফোড়ার ব্যথা। নড়তে পারছেন না। কিন্তু লোভ বলে কথা। ফের গণেশের মূতির দিকে চেয়ে বললেন, বাবা, প্রাণ যায় যাক, টাকাটা দু-হাজার গুণ করে দাও।

তারপর দুরু দুরু বক্ষে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। মধ্যরাত্রে হঠাৎ যেন বজ্রনির্ঘোষের একটা শব্দ হল। তারপর বিশাল জলপ্রপাতের মতো টাকা নেমে আসতে লাগল। আহ্লাদে দু-হাত তুলে চেঁচালেন মদন চৌধুরি। কিন্তু আহ্লাদটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। পঞ্চাশ কোটি টাকার বিপুল ভারে তিনি চাপা পড়ে গেলেন। দম বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। হৃৎপিণ্ড থেমে যাওয়ার মতো অবস্থা। ফের জ্ঞান হারিয়ে ফেললেন তিনি।

জ্ঞান ফেরার পর যখন হামাগুড়ি দিয়ে টাকার স্তূপের ভিতর

থেকে বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর শরীরে আর শক্তি বলে কিছু নেই। মাথা ঘুরছে, জিব বেরিয়ে পড়েছে, সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত। গণেশবাবার মূর্তির দিকে চেয়ে তিনি হাপুস নয়নে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন, আর চাই না বাবা, আমার প্রাণটা রক্ষে করো।

কিন্তু কে শোনে কার কথা! মাঝরাতে ফের টাকার প্রপাত নেমে আসতেই আতঙ্কিত মদন চৌধুরি বিছানা থেকে নেমে ছুটোছুটি করতে লাগলেন। কিন্তু কাঁচা টাকাগুলো তাঁর মাথায় আর গায়েই এসে পড়তে লাগল। ঘরখানা টাকায় ভরে গেল। আর এই বিপুল টাকার নীচে আবার চাপা পড়লেন মদন চৌধুরি।

পরদিন সকালে কাজে বেরোনোর আগে মহাদেব চাট্টি মুড়ি খাচ্ছিলেন। কাঁপতে কাঁপতে, কাঁদতে কাঁদতে মদন চৌধুরি এসে তাঁর সামনে অপরাধীর মতো দাঁড়িয়ে বললেন, ভাই মহাদেব, আমাকে ক্ষমা করো। এই নাও তোমার গণেশ। আমিই চুরি করেছিলুম লোভে পড়ে তার শাস্তি ভালোমতোই পেয়েছি।

গণেশমূর্তি ফিরে পেয়ে মহাদেবেরও চোখে জল এল।

মদন চৌধুরি চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললেন, বহু টাকা দিয়েছিলেন গণেশবাবা। আজ সকালে কেঁদে কেটে বললাম, বাবা তোমার টাকা ফেরত নাও। ও আমার চাই না। এ ধর্মের টাকা লোভী লোকের জন্য নয়। তা দয়া করে গণেশ সব টাকা ফেরত নিয়েছেন আমার ঘরে আর একটিও টাকা নেই। আমিও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।

মহাদেব গণেশমূর্তিকে আবার কুলুঙ্গিতে তুলে রাখলেন। গণেশ যেন হাসতে লাগলেন।

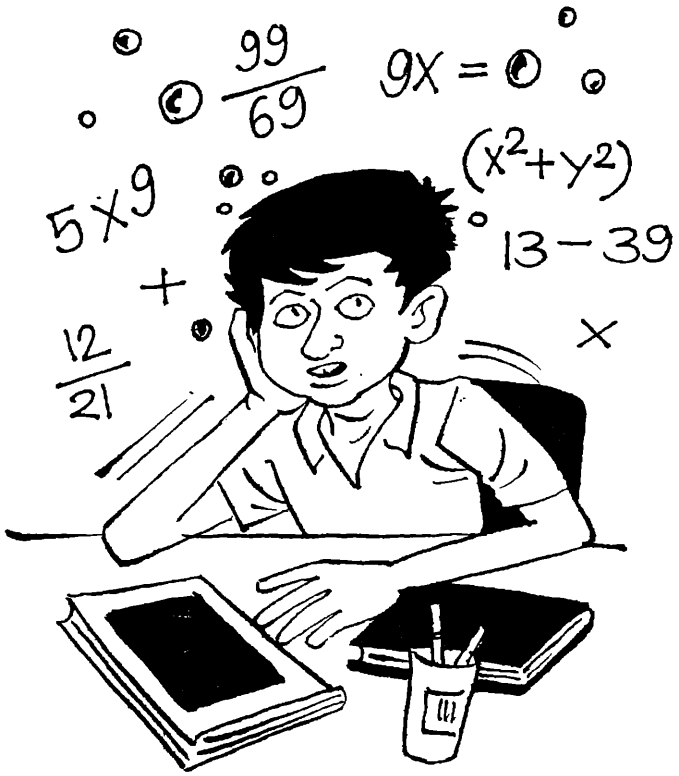

দীপুর অঙ্ক

অঙ্কে দীপুর মাথা খুব ভালো বটে, কিন্তু অন্য বিষয়ে সে একেবারে ন্যাদোস। এবার বার্ষিক পরীক্ষায় সে ইংরেজিতে পেয়েছে বারো, বাংলায় আঠেরো, ইতিহাসে পনেরো এইরকম সব আর কি। মোট পাঁচ বিষয়ে ফেল। তবে অঙ্কে একশোতে একশো। সেই ক্লাস ওয়ান থেকে এই ক্লাস টেন অবধি অঙ্কের নম্বরে কোনও নড়চড় নেই, সেই একশোতে একশো। অনেক চেষ্টা করেও অঙ্কের স্যার কোনওদিন তার এক নম্বরও কাটতে পারেননি।

কথা হল পাঁচ বিষয়ে ফেল করে সে নতুন ক্লাসে ফি বছর ওঠে কী করে? আসলে স্কুলের হেডস্যার বলেন, দীপুর অঙ্কের মাথা যখন এত ভালো তখন সে তো আর গবেট নয়। অন্য বিষয়ে মন দিলে পাশ নম্বর পাবে। মন দেয় না এই যা।

তাই প্রতি বছর স্পেশাল কনসিডারেশনে তাকে প্রমোশন দেওয়া হয়। কিন্তু ক্লাস টেনে ওঠার পর সমস্যা দেখা দিল।

হেডস্যার তাকে ডেকে বললেন, দ্যাখ দীপু, এত দিন তোকে স্পেশাল কনসিডারেশনে প্রমোশন দিয়ে এসেছি বটে, কিন্তু এর পর তো তোকে বোর্ডের পরীক্ষায় বসতে হবে। তখন তোকে কেউ খাতির করবে না। কাজেই মন দিয়ে অন্য বিষয়গুলো পড়। টেস্টে এক বিষয়ে ফেল হলেও কিন্তু অ্যালাউ করা যাবে না। মনে থাকে যেন।

দীপু পড়ল অগাধ জলে। দুনিয়াতে অঙ্ক ছাড়া সে আর

কিছুই বোঝে না। অন্য কিছু তার ভালোও লাগে না। তবে অঙ্কে তার মাথা এমনই খোলতাই যে স্কুলের অঙ্ক তো দূরস্থান বি এসসি ক্লাসের অঙ্ক বইও তার কাছে জলভাতের মতো লাগে। যে-কোনও অঙ্ক—তা সে যত শক্তই হোক—দীপু দেখলেই অঙ্কটা কী চাইছে, কোন পদ্ধতিতে এগোবে এবং শেষে কোথায় পৌঁছোবে তা পরিষ্কার বুঝতে পারে। অঙ্কেরা যেন দীপুর কাছে আত্মসমর্পণ করার জন্যই বসে আছে। কিন্তু অন্য বিষয়ের বইপত্র খুলে যেন দীপুর গায়ে জ্বর আসে। ইংরেজি, বাংলা, ভূগোল, ইতিহাস বড়ই বিস্বাদ লাগে তার। বাংলা বই খুললেই যেন শত্রুপক্ষের সৈন্যরা ঢাল-তলোয়ার নিয়ে তার দিকে তেড়ে আসে। ইংরেজি বই খুললেই যেন বইয়ের পাতা থেকে গোলাগুলি ছুটে আসতে থাকে। ইতিহাস খুললেই যেন একদল ডাকাত 'রে রে' করে ওঠে। ভূগোল বই খুললেই মনে হয় ম্যাপ আর অক্ষরগুলো তাকে নিয়ে হাসাহাসি আর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করছে আর দুয়ো দিচ্ছে।

অথচ পাশ না করলেই নয়। তার গরিব বাপ সাত মাইল দূরের গঞ্জে সামান্য হিসেব রাখার চাকরি করে। বড়ই টানাটানির সংসার। দীপুর আরও দুটো বোন আর দুটো ভাই আছে। দীপু পাশ-টাশ করে চাকরি পাবে এই আশায় তার পরিবারটা বসে আছে। তার ওপর সকলের ভরসার একটাই কারণ যে সে অঙ্কের ভালো ছাত্র।

কিন্তু শুধু অঙ্ক জানলেই যে হবে না তা দীপুর মতো হাড়ে হাড়ে আর কে জানে? মাস্টার রাখার সাধ্য তার নেই, তাই সে মাস্টারমশাইদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে ইংরিজি বাংলা ইত্যাদিতে তালিম নেওয়ার চেষ্টা করল। কিন্তু কাজ বিশেষ এগোলো না। বাংলার স্যার বঙ্কুবাবু একদিন তাকে বললেন, ওরে দীপু, তোর

মাথা হল অঙ্কময়। অঙ্ক ছাড়া তোর যে আর কিছু সয় না। রবীন্দ্রনাথের অত ভালো কবিতাটা মুখস্থ করতে দিলুম, আর তাতে কিনা তোর সর্দি ধরে গেল!

ইংরিজির স্যার নরেনবাবু বললেন, তোর মাথার ভিতরটায় অঙ্কের একেবারে জঙ্গল হয়ে আছে। ওই জঙ্গলে কি আর ইংরিজি সেঁধোতে পারে রে? খানিকটা অঙ্ক মুড়িয়ে কেটে তবে ঢোকার রাস্তা করতে হবে। কিন্তু সে তো হওয়ার নয়।

ইতিহাসের স্যার নন্দবাবু বা ভূগোলের স্যার পাঁচুবাবুও বিশেষ আশা দিতে পারলেন না। শুধু বলে দিলেন, মাথায় অঙ্কের ভাবটা না কমালে অন্য সব বিষয়ের সেখানে জায়গা হচ্ছে না।

দীপু ভারি দমে গেল। এতকাল অঙ্কই ছিল তার বন্ধু। কিন্তু এখন মনে হতে লাগল অঙ্কের মতো এমন শত্রু তার আর কেউ নেই। রাগ করে দিন দশেক সে অঙ্কের বই ছুঁল না, একটাও অঙ্ক করল না। তাতে তার মাথা ধরল, আইঢাই হতে লাগল, খিদে কমে গেল, অনিদ্রা হতে লাগল। তবু সে দশ দিন অঙ্কহীন কাটিয়ে দিল। কিন্তু অঙ্ক ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে বিশেষ লাভ হল না, দশদিন বাদে যখন ফের অঙ্ক কষতে বসল তখন তার মাথা থেকে অবরুদ্ধ অঙ্কের স্রোত বাঁধভাঙা বন্যার মতো বেরিয়ে এল। ভারি আনন্দ হল তার, ভারি ভালো লাগতে লাগল। নাঃ, অঙ্ক ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করে লাভ নেই। সে মাথায় অঙ্ক নিয়েই জন্মেছে, একে মাথা থেকে তাড়াবে কী করে?

কিন্তু কথা হল, মাথার মধ্যে অঙ্ক গিজগিজ করছে বলে অন্য বিষয়গুলো ঢুকতে চাইছে না। ইতিহাসের স্যার মৃগাঙ্কবাবুও বলছিলেন, বুঝলি দীপু, অঙ্ক হল একটা গুণ্ডা সাবজেক্ট, যেমন ষণ্ডা তেমনি রাগী জিনিস। ইতিহাস হল দুর্বল, ভীতু জিনিস।

তোর মাথায় অঙ্কের দাপাদাপি দেখে ভয়ে ভীতু ইতিহাস ঢুকতেই চাইছে না।

ভূগোলের অন্য স্যার রমেশবাবু তাকে ভূগোল শেখানোর চেষ্টা করে অবশেষে একদিন ক্ষ্যামা দিয়ে বললেন, তোকে কথাটা বলি-বলি করেও এতদিন বলিনি। বুঝলি দীপু, অঙ্ক হল আসলে এক ধরনের ভূত। ও যার ঘাড়ে চাপে তার নিস্তার নেই। ওঝা-বদ্যি ডেকেও লাভ হয় না। আমার সেজোমামার কথাই ধর না, দিব্যি খেয়েদেখে ফূর্তি করে দিন কাটাচ্ছিলেন, হঠাৎ একদিন অঙ্কের বাই চাপল। চাপল তো চাপলই। নাওয়া-খাওয়া ভুলে গেলেন, কাছাকোছার ঠিক নেই, ধান শুনতে কান শোনেন। শেষে পাগলা-গারদে দেওয়ার জোগাড়। শেষে অঙ্ক কষে কষেই জীবনটা শেষ হয়ে গেল।

ভূত হোক, গুণ্ডা হোক, অঙ্কের জন্যই যে তার বেশি ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে এটা বুঝতে পারছে দীপু, কিন্তু অঙ্কের হাত থেকে পরিত্রাণই বা কোথায়? ভেবে ভেবে সে রোগা হয়ে যেতে লাগল।

কপালটাই খরাপ। টেস্ট পরীক্ষায় পাঁচ বিষয়ে ডাব্বা মারল সে, শুধু অঙ্কে কোনও নড়চড় হল না, সেই একশোতে একশো।

হেডস্যার ডেকে দুঃখ করে বললেন, এবারটা আর মাধ্যমিক দেওয়া হল না তোর, এক বছর ভালো করে পড়, এর পরের বার দিস।

চোখে ফেটে জল এল দীপুর। বাবা বলে রেখেছে টেস্টে অ্যালাউ হতে না পারলে জোত-জমির কাজে লাগিয়ে দেবে। সেই ভালো, চাষবাস করতে-করতে মাথা মোটা হয়ে যাবে তার। অঙ্কেও ভাঁটা পড়বে।

ইস্কুল থেকে বেরিয়ে দীপু নীলকুঠির নির্জন পোড়ো জমিতে একটা গাছতলায় এসে চুপচাপ বসে রইল। মনটা বড়ই খারাপ। তার লেখাপড়া তাহলে এখানেই শেষ।

শীতের বেলা পড়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে। দীপুর তবু বাড়ি ফিরতে ইচ্ছে হল না, বসে বসে নিজের অন্ধকার ভবিষ্যতের কথা ভাবতে লাগল।

এমন সময় কাছেপিঠে মানুষের গলা শুনতে পেল দীপু। চাষি-বাসি বা রাখাল ছেলেরাই হবে। প্রথমটা অত খেয়াল করেনি। একটু বাদেই মনে হল কথাগুলো খুব কাছেই কারা যেন বলাবলি করছে। কিন্তু ভাষাটা যেন কেমনতরো, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। দীপু চারপাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পাচ্ছিল না। চারদিকে ঘন ঝোপঝাড়, তার ওপর শীতের বেলা ফুরিয়ে অন্ধকারও হয়ে এসেছে অনেকটা।

দীপু একটু অবাক হয়ে গলা খাঁকারি দিয়ে বলল, কে ওখানে?

সঙ্গে সঙ্গে কথা বন্ধ হয়ে গেল। দীপু জানে নীলকুঠিতে পুরোনো সব সাহেব ভূত আছে। সেই ভয়ে রাতবিরেতে এদিকে কেউ আসে না। তারও একটু ভয়-ভয় করছিল। তবে মন খারাপ বলে ভয়টা তেমন বেশি হল না। সে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল।

বাড়ি যাওয়ার জন্য পা বাড়িয়েও দীপু থমকে গেল।

তার সামনে পথ আটকে তিনজন লোক দাঁড়ানো। তিনজনের চেহারাই একরকম এবং অদ্ভুত। বেঁটে, পেটমোটা, মাথায় টাক। তিনজনেরই পরনের হেঁটো ধুতি আর ফতুয়ার মতো জামা, দেখলে মনে হয় সার্কাসের বামনবীর জোকার।

দীপু ভারি অবাক হয়ে তিনজনকে দেখছিল।

তিনজনের মাঝখানের জন একটু এগিয়ে এসে নিজের টাকে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, ওহে বাপু, আমরা একটু বিপাকে পড়েছি, সাহায্য করতে পারো?

দীপু ঢোঁক গিলে বলল, কীরকম সাহায্য?

লোকটা ফস করে একটা কাগজ আর পেনসিল বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, দ্যাখো তো বাপু, অঙ্কটা কষতে পারো কিনা।

দীপু অঙ্ক দেখলেই পাগল হয়। সে আর দ্বিরুক্তি না করে কাগজটা নিয়ে খসখস করে অঙ্কটা কষতে লাগল। মিনিট পাঁচেক বাদে কাগজটা ফেরত দিয়ে বলল, এই নিন, হয়ে গেছে।

লোকটা বাঁ-হাতে কাগজটা নিয়ে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একবার চেয়ে সঙ্গীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, না হে বীজদত্ত, সংখ্যাদত্ত, ছোকরার এলেম আছে।

বাকি দুজন একটু মুখ তাকাতাকি করল।

মাঝখানের জন দীপুর দিকে চেয়ে বলল, বুঝলে ছোকরা, জগতে অঙ্ক ছাড়া আর কিছুই নেই। অঙ্কময়ং জগৎ, দুনিয়াটা চলছেই তো অঙ্কের জোরে। গান বলো, কবিতা বলো, সাহিত্য বলো সবকিছুর পিছনেই দেখবে অঙ্ক ঠিক ঘাপটি মেরে আছে। এই যে ফুল ফোটে, জ্যোৎস্না ওঠে, মলয় পবন বয়ে যায়, একটু চেপে যদি ভেবে দ্যাখো তাহলে দেখবে তার পিছনেও ওই অঙ্কেরই খেলা। তা শুনলাম তোমার নাকি অঙ্ক নিয়ে কীসব সমস্যা হচ্ছে! সত্যি নাকি?

দীপুর চোখে জল এল, সে ধরা গলায় বলল, আপনারা কি অন্তর্যামী?

লোকটা শশব্যস্তে বলে ওঠে, আহা, চোখের জল ফেলার

কী হল হে ছোকরা? তা বাপু, অন্তর্যামী আমরা বটে। আমার নাম হল ঘণক। আমি হলুম গো জ্যামিতি, ত্রিকোণোমিতি আর ঘণকের দেবতা। আমার নাম ঘণকদত্ত। আর ওই যে বাঁদিকেরটি উনি হচ্ছেন বীজগণিত আর কল্প অঙ্কের দেবতা। বীজদত্ত। আর ডানদিকেরটি সংখ্যাবিদ সংখ্যাদত্ত।

দীপু চোখ বড় বড় করে বলল, আপনারা দেবতা নাকি? কই, এরকম নাম তো শুনিনি!

লোকটা টাকে হাত বোলাতে-বোলাতে বিজ্ঞের মতো হেসে বলে, তেত্রিশ কোটি দেবদেবীর মধ্যে কজনের নাম জানো হে ছোকরা? যদি চেপে ধরি তাহলে তেত্রিশ জনের নামও কি বলতে পারবে?

দীপু ভয় খেয়ে বলল, আজ্ঞে না।

তা হলে।

দীপু আমতা-আমতা করে বলে, আমি শুনেছিলুম লেখাপড়ার দেবতা হলেন মা সরস্বতী।

তা তো বটেই। কিন্তু লেখাপড়া তো আর চাট্টিখানি জিনিস নয়। বিশাল সমুদ্দুর। মা সরস্বতীর অধীনে এই আমরাই নানা শাখা-প্রশাখা আগলাই। তা ধরো কয়েক হাজার তো হবেই। কেউ ছন্দ সামলায় তো কেউ অলঙ্কার, কেউ কাব্য সামলায় তো কেউ গদ্য। গদ্যেরও আবার কত ভাগ, প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাস। তারপর ধরো ইতিহাস, ভূগোলের পিছনেও মেলা দেবতাকে মেহনত দিতে হচ্ছে। বিশাল কর্মযজ্ঞ হে, বিশাল কর্মযজ্ঞ। তা ওসব কথা থাক, তোমার সমস্যাটা কী হচ্ছে বলো তো!

দীপু ম্লানমুখে বলল, অঙ্ক ছাড়া আর সব বিষয়েই যে আমি

বছর বছর ফেল করি!

লোকটা সঙ্গীদের দিকে ফিরে বলল, ওহে সাংখ্যাদত্ত, বীজদত্ত, কী বুঝছ?

সঙ্গী দুজন মাথা নেড়ে গম্ভীর মুখে প্রায় একসঙ্গেই বলল, অসম্ভব!

ঘনক দীপুর দিকে ফিরে এক গাল হেসে বলল, শুনলে তো! জগৎটাই অঙ্কময়। যে অঙ্ক জানে সে তো কেল্লা মেরেই দিয়েছে।

তা হলে আমি ফেল করি কেন?

ঘণক মাথা চুলকে বলে, কেন ফেল করো তার কারণটা খুব জটিল, বললেও তুমি বুঝবে না। শুধু এটুকু বলি, তোমার মাথাটা একটা ঘর। তুমি সেই ঘরের মধ্যে দরজা-জানলা এঁটে অঙ্ককে কয়েদ করে রেখেছ। কুনকে হাতি কাকে বলে জানো?

আজ্ঞে না।

কুনকে হাতি হল এক ধরনের পোষা হাতি, যারা জঙ্গলের বুনো হাতিকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে আসে, তারপর হাতি মানুষের ফাঁদে ধরা পড়ে।

আজ্ঞে বুঝলাম।

কিছুই বোঝোনি। অঙ্ক হল তোমার কুনকে হাতি, তাকে আটক রাখলে তো চলবে না। তাকে ছেড়ে দাও। অঙ্কই গিয়ে ইংরেজি, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোলকে ধরে আনবে।

দীপু অবাক হয়ে বলে, কী করে?

ওই যে বললুম, অঙ্কময়ং জগৎ, সব কিছুর মধ্যেই যে চোরা অঙ্ক রয়েছে সেটাই তুমি ধরতে পারোনি। ওই অঙ্ক দিয়েই সব কিছু বোঝার চেষ্টা করো, তাহলেই দেখবে কেল্লা ফতে।

দীপু হাঁ করে রইল।

ঘণক বলল, আমরা তোমাকে বর দিতে এসেছি। বর মানে জানো?

একটু একটু জানি।

ছাই জানো। বর মানে বরণ করা। যা পেতে হবে, যা পেতে চাও তার জন্য সব কষ্টকে বরণ করে নেওয়াই হচ্ছে বর লাভ। বুঝলে?

দীপু ভয় খেয়ে বলল, যে আজ্ঞে।

তা কষ্টটা কি করবে?

যে আজ্ঞে।

তথাস্তু। বলে তিন বেঁটে দেবতা হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল।

দীপু চমকে উঠে বুঝতে পারল, সে গাছতলায় বসে ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে এতক্ষণ স্বপ্ন দেখেছে।

কিন্তু স্বপ্নটাকে খুব একটা অবিশ্বাস্য মনে হল না তার। অন্ধকার হয়ে এসেছে। দীপু উঠে বাড়ি ফিরে গেল।

পরের বছর টেস্ট পরীক্ষায় দীপুর নম্বর হল বাংলায় আশি, ইংরেজিতে বিরাশি, ভূগোলে নব্বই, ইতিহাসে পঁচাত্তর, অঙ্কে সেই একশোতে একশো।

না, দীপুর আর অঙ্কের ওপর অভিমান নেই।

সময় সরণি

আচ্ছা, এটা কি সুধীরবাবুর বাড়ি? হ্যাঁ, আমিই সুধীর ভট্‌চায। আপনি কে বলুন তো?

আমাকে ঠিক চিনবেন না। বিশেষ প্রয়োজনে আসা। ভিতরে আসতে পারি কি?

আসুন।

এখানে বোধহয় দরজার বাইরে চটি ছেড়ে ঢোকার নিয়ম, তাই না?

তা নিয়ম একটা আছে বটে, যদি আপনার অসুবিধে না হয়, তাহলে—

না, না, ঠিক আছে। চটি ছেড়েই আসছি।

আসুন, বসুন।

আপনাদের এ জায়গাটা বেশ গরম।

তা তো বটেই। গ্রীষ্মকালে এ দেশে গরম পড়ে। আপনি কি এ দেশে থাকেন না?

না, না, আমিও এ দেশেই থাকি। মাত্র কয়েক মাইল তফাতে। তবে আমাদের ওখানে বিশেষ গরম নেই।

কয়েক মাইলের তফাতে তো আর দার্জিলিং পাহাড় নয় মশাই।

না, না, অত দূরের কথা বলছি না। আমি শ্যামবাজারের দিকটায় থাকি।

তা শ্যামবাজারে গরমের অভাব কি? কালও তো হাতিবাগানে গিয়ে গলদঘর্ম হয়েছি। আপনি বোধহয় এয়ার কন্ডিশনে থাকেন।

খানিকটা তাই।

তাই বলুন।

তবে সেটা ন্যাচারাল এয়ার কন্ডিশনিং।

সেটা আবার কীরকম?

এমন সব গাছ আছে যা কুলিং সিস্টেমের কাজ করে।

গাছ! শ্যামবাজারে আবার গাছ কোথায় পেলেন?

সে কথা থাক। আগে জরুরি কথাটা সেরে নিই।

হ্যাঁ বলুন।

এখন ঘড়িতে বাজছে সকাল ন'টা। ঠিক তো!

হ্যাঁ। কাঁটায়-কাঁটায়।

ঠিক দশটা পঁয়ত্রিশ মিনিটে এ-বাড়িতে একটা ঘটনা ঘটবে। আর সেইজন্যই আমার আসা।

ঘটনা! কী ঘটনা বলুন তো। দিনেদুপুরে ডাকাত পড়বে নাকি?

না, না। অত বড় ঘটনা নয়। খুবই তুচ্ছ একটা ঘটনা, কিন্তু তার তাৎপর্য গভীর।

আপনি কি জ্যোতিষী?

আজ্ঞে না। তবে আমি লজিক্যাল।

তার মানেটা কী দাঁড়াচ্ছে? আপনি কি পাগল?

দাঁড়ান, আমার কথাগুলো একটু হেঁয়ালির মতো হয়ে যাচ্ছে বোধহয়। আসলে এখনকার বাংলা ভাষায় কথা বলতে তেমন অভ্যস্ত নই তো, তাই।

আপনি কি বাঙালি নন?

বাঙালিই, তবে একটু অন্যরকম বাঙালি। আমাদের বাংলাটা একটু অন্যরকম।

তা হতেই পারে। শুনেছি চট্টগ্রাম বা সিলেটের বাংলা বেশ অন্যরকম।

প্রবলেমটা অনেকটা সেরকমই। যাই হোক, একটু বুঝিয়ে বলছি।

বলুন।

আপনার ছেলের নাম কিংশুক ভট্টাচার্য তো?

হ্যাঁ, কিন্তু আপনি তাকে চিনলেন কী করে?

তিনি আমার দাদু।

দাদু! বলেন কি মশাই! আপনার মাথায় তো বেশ গণ্ডগোল! আমা ছেলের বয়স মাত্র আট মাস। আর কিংশুক নামটাই যে শেষ অবধি রাখা হবে তারও ঠিক নেই।

প্লিজ। দয়া করে ওঁর নাম কিংশুকই রাখবেন। দু-হাজার বাষট্টি সালে কিংশুক ভট্টাচার্য নামেই উনি নোবেল প্রাইজ পাবেন। নাম পালটালে অনেক গণ্ডগোল হয়ে যাবে।

আচ্ছা মশাই, আপনি এখন আসুন। আমার অনেক কাজ আছে।

ভয় পাবেন না, আমি পাগল নই। আমি সত্যিই কিংশুক ভট্টাচার্যের নাতি। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললেই বুঝতে পারবেন।

আপনি কি টাইম মেশিনের গপ্পো ফাঁদবেন? ভবিষ্যৎ থেকে উড়ে এসেছেন। ওসব গুলগপ্প আমাদের ঢের জানা আছে। আমরা ঘনাদার গল্প অনেক পড়েছি। স্টিফেন হকিং বলেই

দিয়েছেন টাইম ট্রাভেল সম্ভব নয়। মিচকি মিচকি হাসছেন যে!

স্টিফেন হকিং তো আর সব সত্যের সন্ধান জানতেন না, অধিকাংশ সত্যই হল আপেক্ষিক। এক এক দেশে এক এক সময়ে এক এক পরিবেশ বা পরিস্থিতিতে এক-একটা জিনিসকে সত্য বলে প্রতীয়মান হয় মাত্র। আমি সত্যিই সময়ের সরণী বেয়ে এসেছি। আমি সম্পর্কে আপনার ছেলে কিংশুকের নাতি, আপনার পুতি।

হাঃ হাঃ, মশাই, বেড়ে গল্প ফেঁদেছেন। আসল কথাটা কী বলুন তো!

সেই কথা বলতেই আসা। নইলে আমরা সহজে টাইম ট্রাভেল করি না, তাতে অনেক রকম বিপত্তি হয়। যা বলছি দয়া করে শুনুন। বেলা দশটা কুড়ি মিনিট নাগাদ আপনার বন্ধু বঙ্কুবিহারী আর অরূপ মাইতি আসবেন। দশটা পঁচিশ মিনিট নাগাদ আপনার স্ত্রী তাঁদের দুজনকে দুটি করে সিঙাড়া পরিবেশন করবেন। সিঙাড়াগুলো আপনি গতকালই একটি মাড়োয়ারি দোকান থেকে কিনে এনেছেন, কিন্তু অত্যধিক ঝাল বলে খেতে পারেননি, ফ্রিজে রেখে দেওয়া আছে। আপনার স্ত্রী সেগুলোই মাইক্রোওয়েভে গরম করে দেবেন। দশটা বত্রিশ নাগাদ অরূপ ও বঙ্কুবিহারী ঝালে হাঁসফাঁস করতে করতে ঠান্ডা জল চাইবেন। আপনার স্ত্রী ফ্রিজের জল দিতে এ-ঘরে আসবার উপক্রম করবেন। আর তখনই ঘটনাটা ঘটবে। আপনি ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন?

একটু অবাক হচ্ছি। সিঙাড়ার ঘটনাটা সত্যি। বাকিগুলো সত্যি কিনা—

সত্যি। একটু বাদেই বুঝবেন।

আচ্ছা বেশ। কিন্তু ঘটনাটা কী?

আপনার স্ত্রী-র হাত থেকে একটা কাচের গেলাস পড়ে গিয়ে ভাঙবে এবং গেলাসের জল পড়ে পিছল মেঝেতে আপনার স্ত্রী আছাড় খেয়ে পড়ে ফিমার বোন ভাঙবে।

সর্বনাশ!

আরও সর্বনাশ হল ফিমার বোন ভেঙে আপনার স্ত্রী শেষ অবধি পঙ্গু হয়ে যাবেন এবং তার ফলে চিনাংশুক জন্মাতে পারবে না।

চিনাংশুক। সে কে?

কিংশুকের ছোট ভাই।

বলেন কি?

যা বলছি দয়া করে শুনুন। চিনাংশুক না জন্মালে খুবই গণ্ডগোল হয়ে যাবে।

দাঁড়ান মশাই দাঁড়ান। আপনি নিজে তো পাগল বটেই, কিন্তু আপনার পাগলামির চোটে যে আমারও পাগল হওয়ার জোগাড়। কী সব আবোল-তাবোল বকছেন?

রেগে যাবেন না, মাথা ঠান্ডা করুন। সমস্যাটা অনুধাবন করার চেষ্টা করুন।

সমস্যাটা কী?

সমস্যা হচ্ছে এক গেলাস জল। ওই এক গেলাস জলই ভাবী কালের ইতিহাস পালটে দিতে পারে। আর সেইজন্যই আমার আসা।

আপনার গুলগল্পে আমি বিশ্বাস করি না। আপনি আসুন এখন।

আপনার যাতে বিশ্বাস হয় সেইজন্য দু-হাজার বাষট্টি সালের একটি খবরের কাগজ আমি সঙ্গে করেই এনেছি। এটি অবশ্য আপনাদের সংবাদপত্রের মতো নিউজপ্রিন্টে ছাপা নয়, এটি ছাপা হয়েছে সিনথেটিক পেপারে। এই যে ফ্রন্ট পেজে বড় হেডিং-এ খবরটা দেখুন।

ও বাবা! এ তো দেখছি কিংশুক ভট্টাচার্য পদার্থবিদ্যায় সত্যিই নোবেল প্রাইজ পেয়েছে? এটা জালি ব্যাপার নয় তো?

ওই খবরের কাগজটা যে মেটেরিয়ালে ছাপা হয়েছে তা আপনি কখনও দেখেছেন?

না মশাই! এ তো ভারি নরম অথচ মোলায়েম জিনিস। আর ছাপাও তো দারুণ সুন্দর। কিন্তু ভাষাটা একটু যেন কেমন কেমন। সব বাক্য বোঝা যাচ্ছে না।

ভাষা এক নিরন্তর পরিবর্তনশীল জিনিস। আমাদের আমলে ভাষা অনেক সংকেতময় হয়েছে।

তাই দেখছি।

এখন কি একটু-একটু বিশ্বাস হচ্ছে।

আমি ধাঁধায় পড়ে গেছি। তা আপনি যদি টাইম ট্রাভেলার হয়েই থাকেন তা হলে আপনার গাড়ি কই?

টাইম ট্রাভেল করতে গাড়ি লাগে নাকি?

সিনেমার-টিনেমায় তাই তো দেখি।

ও তো আজগুবি ব্যাপার। তবে গাড়ি না হলেও একটা শ্যাফ্‌ট বা লম্বা নলের মতো জিনিস আছে। ওর টেকনোলজি

আপনি ঠিক বুঝবেন না। তবে শ্যাফ্‌টটাও আপনার বাড়ির সামনের ওই খেলার মাঠটায় রয়েছে। ওটা দেখতে পাবেন না, কারণ ওটা ওখানে রয়েছে রাত তিনটের স্লটে। দিনে-দুপুরে শ্যাফ্‌টটা দেখতে পেলে লোকের অনাবশ্যক কৌতূহল হবে।

যাক গে, এখন খোলসা করে বলুন ব্যাপারটা কী।

ব্যাপারটা সংক্ষেপে হল। সময়ের শরীরে মাঝে-মাঝে এক-আধটা কুঞ্চন দেখা দেয়, এই কুঞ্চনের ফলে অনেক সময়ে পরবর্তী ঘটনাবলীতে প্রভাব পড়ে। আমরা তেমন বিপজ্জনক কুঞ্চন দেখলে সেটাকে একটু মসৃণ করে দিই মাত্র। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। কিংশুক ভট্টাচার্য দু-হাজার বাষট্টি সালে যে গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার পাবেন তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার স্ত্রীর যদি আজ ফিমার বোন ভাঙে এবং চিনাংশুক না জন্মায় তাহলে কিংশুক ভট্টাচার্য সেই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারটা করতে পারবেন না।

কেন মশাই?

তার কারণ কিংশুক একমাত্র সন্তান হলে তাকে আপনারা অত্যাধিক আদর দেবেন এবং অতি আদরে সে অলস অপদার্থ এবং বখা হয়ে যাবে। ফলে তার পক্ষে আর আবিষ্কারটা সম্ভব হবে না। চিনাংশুক জন্মালে কিন্তু আপনাদের মনোযোগ সে অনেকটাই কেড়ে নেবে এবং কিংশুক ভট্টাচার্যও অ্যাকটিভ থাকবেন।

বটে! এ তো সাংঘাতিক ব্যাপার।

হ্যাঁ। কিন্তু দশটা পনেরো বাজে। প্রস্তুত হোন।

কী করতে হবে মশাই?

আপনি কিছুই করবেন না। শুধু আপনার স্ত্রী যখন জলটা আনবেন তখন উঠে গিয়ে আপনি ওঁর হাত থেকে গেলাস দুটো নিয়ে নেবেন। টাইমিংটা কিন্তু খুব জরুরি। এক সেকেন্ড আগে বা পরে হলেই ব্যাপারটা কেঁচে যাবে।

বুঝেছি।

খুব সাবধান। ওই ডোরবেল বাজছে, আপনার বন্ধুরা এসেছেন।

দরজা কি খুলে দেব?

দিন। আমার নাম অশঙ্ক ভট্টাচার্য। আমাকে আপনার দূরসম্পর্কের আত্মীয় বলে পরিচয় দিতে পারেন বন্ধুদের কাছে।

তাই হবে। বলে গিয়ে সুধীরবাবু দরজা খুলে দেখলেন সত্যিই বঙ্কু আর অরূপ এসেছে।

তার পরের ঘটনাগুলো ঠিক যেমনটি অশঙ্ক বলেছিল তেমনই ঘটতে লাগল। ঝাল সিঙাড়া খেয়ে দুজনেই বলে উঠল, বউদি, ঠান্ডা জল দিন।

অশঙ্ক চোখের ইশারা করে সুধীরবাবুকে বলল, এইবার। খুব সাবধান কিন্তু—

সুধীরবাবু তাড়তাড়ি উঠে পড়লেন এবং তাঁর স্ত্রী যখন ফ্রিজের বোতল বের করে গেলাসে জল ঢালছেন তখনই গিয়ে বললেন, দাও গেলাস দুটো, আমি নিয়ে যাচ্ছি।

তুমি! তুমি নেবে কেন?

আহা, দাও না। তুমি পড়ে-টড়ে গেলে যে সর্বনাশ।

পড়ব! আমি পড়ব কেন?

পড়ারই কথা কিনা। আর তুমি পড়লে চিনাংশু জন্মাতে পারবে না। তাহলে যে সর্বনাশ।

বলি সকালেই গাঁজা টেনেছ নাকি? কী সব বাজে বকছো! সরো, জল আমি নিয়ে যাচ্ছি।

আহা-হা, করো কী, করো কী।

বলে সুধীরবাবু তাঁর স্ত্রীর হাত থেকে গেলাস দুটো একরকম কেড়েই নিতে গেলেন। আর টানা-হ্যাঁচড়ায় একটা গেলাস হাত ফসকে পড়ে শতখান হয়ে ভাঙল এবং স্ত্রী নয়, সুধীরবাবু নিজেই পিছলে দড়াম করে পড়ে গেলেন।

স্ত্রী আর্তনাদ করে উঠলেন। বন্ধুরা ছুটে এল। সঙ্গে অশঙ্কও। ধরাধরি করে তোলা হল তাঁকে। বাঁ-হাতটায় প্রচণ্ড লেগেছে।

বঙ্কু ডাক্তার। হাতটা ভালো করে দেখে বলল, কনুইয়ের কাছটা তো ফ্র্যাকচার হয়েছে বলেই মনে হচ্ছে। ভোগাবে।

সুধীরবাবুর মুখে অবশ্য হাসি। অশঙ্কের দিকে চেয়ে চোখ টিপে বললেন, কী হে বাপু, কেমন সামলে দিয়েছি?

অশঙ্ক মৃদু হেসে বলল, হ্যাঁ, সময়ের যে কুঞ্চনটা ছিল সেটা এখন সটান হয়ে গেছে।

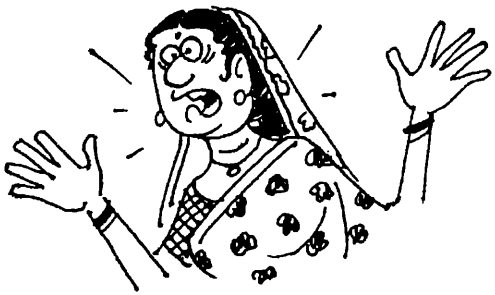

উল্কা ও ষষ্ঠীচরণ

ষষ্ঠীচরণ পায়চারি করছিল। আর পায়চারি করতে বেশ ভালোও লাগছিল তার। তবে কাজটা যত সহজ শোনাচ্ছে ততটা নয়। আসলে সে পাহারায় আছে। পায়চারি করতে করতে তাকে বিশেষ নজরও রাখতে হচ্ছে। তার ওপর বহু মানুষের মরণ-বাঁচন নির্ভর করছে। একটু ভুলচুক হলেই বা নজরদারিতে গাফিলতি ঘটলেই অতি বিপর্যয় কাণ্ড ঘটে যাবে।

তার কানে হেডফোন লাগানো আছে। ঘ্যানাবাবু হচ্ছেন অপারেশন ম্যানজার। ফোনে হঠাৎ তাঁর হেঁড়ে গলা শোনা গেল, বলি ওহে ষষ্ঠীচরণ, ঘুমিয়ে পড়োনি তো!

আজ্ঞে না স্যার, দিব্যি জেগে আছি।

হুঁশিয়ার থেকো হে, উল্কাটার মতিগতি খুব ভালো ঠেকছে না। ব্যাটা চাঁদের পিছনে ঘাপটি মেরে আছে বলে মনে হচ্ছে। দূরেই আছে এখনও, তবে যে-কোনও সময়ে এসে পড়তে পারে।

চিন্তা করবেন না স্যার, আমি নজর রাখছি।

তুরপুনটা রিলিজ করার সময় হলেই তোমাকে সিগন্যাল দেব। ভগবানের নাম ধরে ছেড়ো হে, বড্ড সাবধানে কাজ করতে হবে।

যে আজ্ঞে, শুধু একটা কথা স্যার।

কথা! কী কথা বলে ফ্যালো।

আজ্ঞে, আমার প্রমোশনটা অনেকদিন আটকে আছে।

আরে, ওসব নিয়ে ভাবতে হবে না। তুমি আগে রাক্ষসটাকে তো আটকাও। কাজটা উদ্ধার হলে বরদাবাবু খুশি হবেন। তখন তোমারও হিল্লে হয়ে যাবে।

যে আজ্ঞে।

ষষ্ঠীচরণ ফের পায়চারি করতে থাকে। অন্যমনস্ক হলে চলবে না। ঘুম পেলে চলবে না। ভুলচুক হলে চাকরি যাবে। ষষ্ঠীচরণ গরিব মানুষ, চাকরি গেলে খুব সমস্যায় পড়ে যাবে। আর সেইজন্য সে পায়চারির গতিবেগ বাড়িয়ে দেয়।

অসুবিধের ব্যাপার হল, সে পায়চারি করছে মহাশূন্যে একটা বিশাল কৃত্রিম স্যাটেলাইটের পিঠের ওপর। কোমরে অবশ্য ধাতব দড়ি বাঁধা আছে স্যাটেলাইটের সঙ্গে। ছিটকে যাওয়ার ভয় নেই। আর পায়ে আছে বিশেষ ধরনের সোলওয়ালা জুতো যাতে পা স্যাটেলাইটের সঙ্গে সেঁটে থাকে। স্যাটেলাইটের ওপর একটা মাউন্ট করা হারপুন। হারপুনের ডগায় ওয়ারহেড লাগানো। এই অস্ত্র দিয়েই নচ্ছার উল্কাটাকে টিট করতে হবে। ষষ্ঠীচরণ খুবই ভালো তিরন্দাজ। উল্কাটার গতিবিধি কিছু বিচিত্র বলে শুধু যন্ত্র দিয়ে লক্ষ্যভেদের ওপর নির্ভর না করে ষষ্ঠীচরণকে ডাকা হয়েছে। হারপুনটা যন্ত্রের সাহায্যেই নিক্ষেপ করা হবে বটে, তবে ষষ্ঠীচরণ প্রয়োজনে যন্ত্রটাকে সাহায্য করবে।

কানে লাগানো ফোনে তার গাঁ মুকুন্দপুর থেকে মায়ের গলা পাওয়া গেল। ও বাবা ষষ্ঠীচরণ, কখন থেকে আকাশে ঝুলে আছিস বাবা, বলি কিছু খেয়েছিস? পেটে দানাপানি কিছু পড়েছে?

হ্যাঁ মা, এরা বেশ ভালো খাইয়েছে। মাংস, ভাত, রসগোল্লা।

তবে যে শুনি, আকাশে নাকি পাতের ভাত মাছ সব পাত ছেড়ে উড়ে উড়ে বেড়ায়। খেলি কি করে?

সে অনেক ব্যবস্থা আছে। টিউবে করে খাবার দেয়। টুথপেস্টের মতো টিপে টিপে বের করে খেতে হয়।

ও আবার কীরকম অলক্ষুণে খাওয়া?

সেই খাওয়া খুব মজার, গিয়ে সব বলবখন।

তা হ্যাঁ বাবা ষষ্ঠী, কতটা ওপরে উঠেছিস বল তো!

সে অনেক ওপরে মা, কয়েক মাইল তো হবেই।

ও বাবা, তা হলে স্বর্গের কাছাকাছিই হবে বোধ হয়। তা ওখান থেকে স্বর্গের বাগান-টাগান দেখা যায়? শিব, দুগ্গা কাউকে দেখলি বাবা? দেখলে পেন্নাম-টেন্নাম করিস। আর আমাদের দুঃখ-দুর্দশার কথাও একটু জানিয়ে রাখিস।

স্বর্গ বোধহয় আরও ওপরের দিকটায় হবে। ঠিক আছে ঠাকুর-দেবতা কাউকে দেখলে বলবখন।

দেখিস বাবা, পা পিছলে পড়ে-টড়ে যাসনি। অত ওপর থেকে পড়লে হাত-পা ভাঙবে।

না মা, পড়ার কোনও ভয় নেই, তুমি নিশ্চিন্তে ঘুমোও।

দুর্গা দুর্গা। তা সেই মুখপোড়া উল্কাটা কি এখনও আসেনি?

না মা, তবে এল বলে, আর দেরি নেই।

মাকে বেশি জ্ঞান দিয়ে লাভ নেই। মা জানে আকাশের ওপর দিকটায় স্বর্গ। প্রকৃত আকাশ কি বস্তু তা মা জানে না, জেনে আর দরকারও নেই।

উদ্বিগ্ন মুখে আকাশের দিকে চেয়ে ষষ্ঠীচরণ উল্কাটার গতিবিধি নজরে আনার চেষ্টা করছিল। চাঁদটা খুবই কাছে। মাথার ওপর

এত স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। আর বিরাট বড়ও লাগছে চাঁদকে।

হঠাৎ তার কানে লাগানো ফোনে একটা বাজখাঁই গলা একেবারে ফেটে পড়ল, বলি ষষ্ঠীচরণ, শুনলুম দেনার দায়ে জেরবার হয়ে এখন ফাঁকি দেওয়ার তালে আকাশে গিয়ে গা-ঢাকা দিয়েছ। ওতে কিন্তু ভবী ভোলবার নয়। চিরকাল তো আর ঝুল খেয়ে থাকতে পারবে না বাবা। ত্রিশ হাজার টাকার দেনা এখন সুদে আসলে গিয়ে তেষট্টি হাজার সাতশো বাহাত্তরে দাঁড়িয়েছে। এক মাসের মধ্যে শোধ না দিলে ঘটি-বাটি-চাটি করে ছাড়ব। বুঝেছো?

ষষ্ঠীচরণ খুব বুঝেছে। বিগলিত ভাব দেখিয়ে ভারি বিনয়ের সঙ্গে বলল, ভাববেন না নগেনবাবু, টাকাটা ঠিকই দিয়ে দেব। কয়েকটা দিন একটু অসুবিধের মধ্যে আছি। কাঁচা বাড়িতে মা-বাবার বড্ড অসুবিধে হচ্ছিল বলে বাড়িটা পাকা করতে হল কিনা।

মনে রেখো বাপু, জমির দলিল আমার কাছে বাঁধা রেখেছ, টাকা ঠিকমতো শোধ না দিলে জমি নিয়ে নেব। এখন আইন বহুত কড়া।

যে আজ্ঞে, জমি গেলে আমরা খাবই বা কী বলুন!

আকাশ থেকে নেমে তো এসো, তারপর মজাটা টের পাবে।

নগেনবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই হরিপদ সাহার ফোন।

বলি ও ষষ্ঠী, আকাশে উঠে কি হাতে চাঁদ পেয়েছো নাকি হে? আমার দোকানে কত বাকি ফেলেছ জানো? দু-হাজার তিনশো তেইশ টাকা, বুঝলে? আর বাপু, ধারবাকিতে মাল

দেওয়া আমার পোষাবে না বলে দিলুম পষ্ট করে। আমার সাফ কথা, ফেলো কড়ি মাখো তেল।

ভারি কাকুতি-মিনতি করে ষষ্ঠীচরণ বলে, আর দুটো দিন সবুর করুন হরিপদবাবু, আমি ফিরে গিয়েই ধার মিটিয়ে দেবো। বাকিতে মাল না দিলে যে আমার বুড়ো বাপ-মা না খেয়ে মরবে।

না বাপু, আমিও ছাপোষা মানুষ, মুদির দোকান থেকেই আমরাও সংসার চালাতে হয়। আর বাকিতে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

আর তিনটে দিন হরিবাবু, দেখতে দেখতে কেটে যাবে, এলুম বলে।

দেখো বাপু, কথার নড়চড় না হয়।

মনটা বড় খারাপ হয়ে গেল ষষ্ঠীচরণের। মা-বাপ আর ভাই ও বোনদের সে বড় ভালোবাসে। কিন্তু তারা বড়ই গরিব। সে মহাকাশ গবেষণাগারের সামান্য টেকনিক্যাল অ্যাসিস্ট্যান্ট। সামান্য বেতনে সংসার চালাতে পারে না। সে ক্রস বোতে তিরন্দাজি শিখেছিল এক সাহেবের কাছে। তাতে একসময়ে তার একটু নামও হয়েছিল।

কিছুদিন আগে আকাশের এক কোণে বড়সড় উল্কার সন্ধান পায় মার্কিন আর রুশ বিজ্ঞানীরা। হিসেব-নিকেশ করে দেখা গেছে সেটা পৃথিবীতে এসে পড়বে। এবং পড়বে ভারতবর্ষেরই কোথাও। কিন্তু মার্কিনীদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এখন খুব খারাপ বলে উল্কাটাকে মহাকাশে অনেকদূরে ধ্বংস করে দেওয়ার ব্যাপারে মার্কিনীরা মোটেই গা করেনি। কিন্তু বহু দূর রকেট পাঠিয়ে উল্কাটাকে ছিন্নভিন্ন করে দেওয়ার টেকনোলজি মার্কিনী

ছাড়া কারও নেই। রুশরা একসময়ে ভারতের বন্ধু ছিল বটে, কিন্তু ইদানীং তারা ব্যবসা-বাণিজ্যে লক্ষ্মী লাভ করে সুখে-স্বচ্ছন্দে আছে। মহাকাশ নিয়ে চর্চাতেও তারা বিশেষ আগ্রহী নয়। তবে ভারত গরিব দেশ হলেও মহাকাশ গবেষণায় খুব একটা পিছিয়ে নেই। সুতরাং তারা নিজেরাই এই বিপদ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা করছে! তবে তাদের আন্তর্জাতিক মহাকাশ দূষণ দফতর থেকে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে যে উল্কাটা ধ্বংস করতে তারা যেন বিস্ফোরক ব্যবহার না করে। কারণ মহাকাশে এখন কয়েক হাজার কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীর চারদিকে নানা উচ্চতায় ঘুরপাক খাচ্ছে। বিস্ফোরণে তাদের ক্ষতি হতে পারে। তাই আপাতত শক্তিশালী হারপুন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবং কম্পিউটার দিয়ে তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যন্ত্র ব্যবহারের সবচেয়ে উপযুক্ত লোক ষষ্ঠীচরণ। কারণ সে ক্রস বো তিরন্দাজিতে খুবই পাকা।

আর সেজন্যই ষষ্ঠীচরণ আজ মহাকাশে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিযুক্ত। কিন্তু ষষ্ঠীচরণ বারবারই অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। বড় অনটনের সংসার। এ কাজটা সফল ভাবে করতে পারলে হয়তো তার প্রমোশনটা হবে। কিছু পুরস্কারও পাওয়া যেতে পারে। বাড়ি বাবদ কুড়ি লাখ টাকা ব্যাংকের ধার খানিকটা যদি শোধ দেওয়া যায়। তার চারদিকেই শুধু পাওনাদার।

কানে লাগাল ফোনে অরোরা সাহেবের গলা পাওয়া গেল, আরে এই বুরবক ষষ্ঠীচরণ, তু কিয়া খোয়াব মে হো? আরে উও খতরনাক মিটিওর তো তুরন্ত আর রাহা হ্যায়। গেট রেডি ম্যান।

ষষ্ঠীচরণ তাকিয়ে দেখে সত্যিই চাঁদের পিছন থেকে বেশ বড় একটা মেটে সোনালি রঙের গোলা ছুটে আসছে। তীব্র গতি। একটু বাদেই সেটা পৃথিবীর আবহমণ্ডলে ঢুকে জ্বলে উঠবে। তারপর সোজা গিয়ে মধ্যভারতের কোথাও আছড়ে পড়ে বিশাল এলাকা ধ্বংস করে দেবে। হারপুন ঠিক মতো গেঁথে দিতে পারলে ওটার মাথায় যে একটা ওয়ারহেড লাগানো আছে তাতে সোনিক বুম সৃষ্টি করে উল্কাটিকে বহু খণ্ডে টুকরো করে দেবে। আর সেই টুকরোগুলো পৃথিবীতে পড়ার আগেই আবহমণ্ডলের সঙ্গে সংঘর্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

ষষ্ঠীচরণ তার হারপুন ঘুরিয়ে তৎপর হল। এখন একটু অন্যমনস্ক হলেই সর্বনাশ।

উল্কাটা এত দ্রুত আসছে যে লক্ষ্য স্থির করাই কঠিন। ষষ্ঠী হারপুনে শুয়ে টেলিস্কোপিক ভিউ ফাইন্ডারে চোখ রেখে একটু অবাক হয়ে গেল। উল্কাটা সাধারণ জিনিস নয়। ঠিক অপরিশোধিত সোনার মতো পাটকিলে সোনালি রং। আড়েদীঘে প্রায় সিকি কিলোমিটার তো হবেই।

ষষ্ঠীচরণ খুব ঠান্ডা মাথায় দূরত্বটা মেপে নিল। তারপর অপেক্ষা করতে লাগল। সে জানে সরাসরি বস্তুটাকে লক্ষ্য করে রিলিজ বাটন চাপলে কাজ হবে না, কারণ হারপুন গিয়ে লাগবার আগেই উল্কা জায়গাটা পেরিয়ে যাবে। সুতরাং হারপুন ছাড়তে হবে কয়েক সেকেন্ড আগে উল্কার সম্ভব্য গতিপথের দিকে তাক করে।

কানে লাগানো ফোনে একটা মিঠে গলা শোনা গেল, রামরাম ষষ্ঠীবাবু, ভালো আছেন তো! তবিয়ৎ তন্দুরস্ত আছে তো!

বলছিলাম কি, আপনাকে আমি তিন লাখ রুপিয়া দিব, আপনি উল্কাটাকে ছোড়িয়ে দিন।

ষষ্ঠী অবাক হয়ে বলে, সে কী! কেন বলুন তো!

হামার ঝুনঝুনওয়ালা ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা এখুন খারাপ যাচ্ছে। ক্যালুকুলেশন করে দেখলাম উল্কাটা যেখানে এসে পড়বে সেখানে হামার দশটা গো-ডাউন আছে। গো-ডাউনের সব মাল সরিয়ে নিয়ে তিন ক্রোর রুপিয়ার ইনসিওরেন্স করিয়ে দিয়েছি। উল্কাটা পড়লে হামার কিছু সুবিধা হবে। আপনার ওয়ান পারসেন্ট।

ষষ্ঠী নিবিষ্ট চোখে উল্কাটাকে লক্ষ্য করতে করতে বলল, ঝুনঝুনবাবু আপনি কি জানেন যে, আপনি খুব খারাপ লোক?

হাঁ, হাঁ, কিঁউ জানব না! সবাই জানে, কিন্তু ভগওয়ানই তো আমাকে ভি পয়দা করেছেন। খারাপ লোকেরও কি দরকার নাই ষষ্ঠীবাবু? খারাপ লোকরাও তো সোসাইটিকে সারভিস দিচ্ছে, ঠিক কিনা বলুন?

উল্কাটা ভয়ংকর গতিবেগে চাঁদ পেরিয়ে চলে আসছে। ষষ্ঠী দাঁতে দাঁত পিষে ফোনটা অফ করে দিয়ে একাগ্র হল। গতিপথটা অনুমানে স্থির করে নিয়ে ক্যালকুলেশন করতে লাগল, সবটাই তার নিজস্ব পদ্ধতিতে। তিরন্দাজ হিসেবে তার পক্ষে যতটা সম্ভব নির্ভুল একটা দূরত্ব স্থির করে সে হারপুনের ট্রিগার টিপে দিল। একটা তীব্র ঝাঁকুনি দিয়ে মসৃণ গতিতে হারপুনটা বেরিয়ে গেল নিক্ষেপ যন্ত্র থেকে।

উৎকণ্ঠায় কাঠ হয়ে চেয়ে রইল ষষ্ঠীচরণ, রুপোলি রঙের বিশাল লম্বা হারপুনটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। কালো আকাশ চিরে ছুটছে বিদ্যুতের গতিতে। ওদিক থেকে মেটে সোনার রঙের

উল্কাটাও আসছে ভয়ঙ্কর গতিতে। লাগবে তো! হে ভগবান! ক্যালকুলেশন যথাসাধ্য নির্ভুলই হয়েছে বলে তার ধারণা। কিন্তু...

হারপুনটা লাগল, ষষ্ঠীচরণ যেখানে অবস্থান করছে তার খুব কাছেই ঘটল ঘটনাটা, খুব বেশি হলে আধ-কিলোমিটারের তফাতে। হারপুনটা সোজা গিয়ে উল্কার পেটের মধ্যে ঢুকে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গেই সোনিক বুম চালু হয়ে গেল। আকস্মিক আঘাতে উল্কাটা কি একটু দোল খেল? গতি ব্যাহত হল একটু? পরমুহূর্তে একটা অপূর্ব নিঃশব্দ বিস্ফোরণে কালো আকাশে যেন ছড়িয়ে পড়ল ফুলঝুরির রংবেরঙ। শত খণ্ডে বিচূর্ণ হয়ে নানা দিকে ছিটকে যেতে লাগল বিদীর্ণ উল্কার টুকরোগুলো।

ষষ্ঠীচরণ ভারি তৃপ্তমুখে দৃশ্যটা দাঁড়িয়ে দেখছিল। মুখে একটু বোকাবোকা হাসি। আর ওইটেই ভুল করেছিল সে। কথা ছিল, উল্কাটাকে ভেঙে দেওয়ার সময় সে সটান শুয়ে পড়বে, যাতে কোথাও বিপদ না ঘটে। খেয়াল ছিল না ষষ্ঠীর। হঠাৎ একটা বড়সড় টুকরো ছিটকে এসে সে কিছু বুঝে উঠবার আগেই যেন বিরাশি সিক্কার একটা চড় মেরে শুইয়ে দিল তাকে। ষষ্ঠী জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল স্যাটেলাইটের পিঠের ওপর।

যখন জ্ঞান হল তখন সে কলকাতার এক হাসপাতালের বেডে শুয়ে আছে। চারপাশে সব হোমরাচোমরা মানুষ। এক ভারিক্কি ওপরওয়ালা বলল, বহোৎ খুব ষষ্ঠী, বাহাদুর হো।

আর-একজন বলল, জোর বেঁচে গেছ হে। শ্র্যাপনেলটা প্রায় শেষ করে দিয়েছিল তোমাকে।

ষষ্ঠী হাতজোড় করে বলল, আজ্ঞে আমার মা-বাবার আশীর্বাদ

আর ভগবানের দয়া।

তা তো বটেই। সরকার বাহাদুর তোমাকে পঞ্চাশ লাখ টাকা পুরস্কার দেবে, বুঝেছ।

পঞ্চাশ লাখ!

শুধু তাই নয়। উল্কাটা ছিল পুরো সোনার। যে টুকরোটা এসে তোমার গায়ে লেগেছিল সেটার ওজন বাহাত্তর কেজি, ওটাও তোমাকে দেওয়া হবে।

ষষ্ঠী ফের অজ্ঞান হয়ে গেল।

অনুসরণকারী

এই যে অবনীবাবু?

অ্যাঁ! কিছু বলছেন?

আজ্ঞে হ্যাঁ। বলতেই হচ্ছে মশাই, আপনাকে যত দেখছি ততই হতাশ হচ্ছি।

তাই নাকি? তা আপনি কে বলুন তো! আপনাকে তো চেনা-চেনা মনে হচ্ছে না!

চেনা-চেনা মনে হওয়ার কারণও নেই কিনা। আপনি আমাকে কস্মিনকালেও দেখেননি। এই যে গত দু-ঘণ্টা ধরে আমি আপনার পিছু নিয়েছি সেটা কি আপনি টের পেয়েছেন?

পিছু নিয়েছেন? কী সর্বনাশ? পিছু নিয়েছেন কেন?

সেটা তো ভেঙে বলা যাবে না। বলায় বারণ আছে। শুধু বলছি, আমাকে আপনার পিছু নিতে বলা হয়েছে।

ওরে বাবা! কে বা কারা আপনাকে আমার পিছু নিতে বলল?

সেটাও বলা যাবে না। অনেক প্যাঁচালো ব্যাপার আছে। তবে ব্যাপারটা যে কী তা আমিও ভালো জানি না। পিছু নিতে বলা হয়েছে, আমিও হুকুম তামিল করছি। সঠিক সব খবর জায়গামতো পৌঁছে দিলে কিছু টাকা পাবো।

এ তো খুব দুশ্চিন্তার কথা হল মশাই। কেউ টাকা খরচ করে পিছনে স্পাই লাগিয়েছে, এটা তো বেশ উদ্বেগেরই ব্যাপার।

তা হতে পারে। আপনি হয়তো একজন বিপজ্জনক লোক।

হয়তো বিদেশি রাষ্ট্রের চর বা উগ্রপন্থী বা চোরাই চালানদার বা খুনি বা জোচ্চোর কিংবা...

মুখ সামলে! মুখ সামলে! এসব কী বলছেন বলুন তো? আপনার নামে তো মানহানির মামলা করা যায়।

আহা, প্রথমেই মামলা-মোকদ্দমা এনে ফেললেন কেন? আপনার সম্পর্কে এখনও তো কিছুই প্রমাণ পাওয়া যায়নি।

তাহলে ওসব বললেন যে!

বলিনি। সম্ভাবনার কথা বলছিলাম। কিন্তু মশাই, দু-ঘণ্টা ধরে আপনি আমাকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাচ্ছেন, একবারটিও একটু বেচাল চললেন না! তাহলে পিছু নিয়ে কী লাভ হল বলুন তো?

আচ্ছা মুশকিল! পিছু নিয়ে আপনি কী আশা করেছিলেন বলুন তো?

আশা ভরসা যাই হোক, সে কথা বলে আর লাভ কি? কিন্তু আপনার ভাবগতিক আমার মোটেই ভালো লাগেনি অবনীবাবু।

কেন, কী এমন খারাপ ভাবগতিক দেখলেন?

ধরুন, অফিস থেকে আপনি পাঁচটা নাগাদ বেরোলেন, আর তক্ষুনি আমি আপনার পিছু নিলাম। ঠিক তো?

তা তো ঠিকই। আমার অফিস পাঁচটাতেই ছুটি হয়।

তারপর আপনি অত্যন্ত গদাই লস্করী চালে হাঁটতে-হাঁটতে গিয়ে হেমন্ত কেবিনে ঢুকলেন।

তাও ঠিক।

হেমন্ত কেবিনে ঢুকে আপনি বাঁ দিকে একেবারে কোণের চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

বহুৎ আচ্ছা। তারপর?

তারপর আপনি দুটো টোস্ট আর এক কাপ কফির অর্ডার দিলেন। ঠিক কিনা!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব ঠিক।

দেখলাম, আপনি মরিচ টোস্ট খান, চিনি দেওয়া টোস্ট খান না।

ঠিকই দেখেছেন।

এবং টোস্ট আর কফি খেতে-খেতে আপনি টেবিলে পড়ে থাকা সকালের খবরের কাগজখানা বেশ অনেকক্ষণ ধরে পড়লেন।

বটেই তো। আপনি বেশ ভালো গোয়েন্দা দেখছি!

তবু তো মশাই, ওপরওয়ালার গাল ওঠে না। সর্বদাই কাজের ভুল ধরেন।

খুব অন্যায়, খুব অন্যায়। হ্যাঁ, তারপর বলুন।

প্রায় আধঘণ্টা পর টোস্ট আর কফি খেয়ে খবরের কাগজ পড়ে আপনি উঠলেন। তারপর হাঁটতে-হাঁটতে হেঁদো। আচ্ছা মশাই, হেঁদোর জলে ছেলে-ছোকরাদের দাপাদাপি অত মন দিয়ে দেখার কী আছে বলুন তো! দেখলাম, আপনি খামোখা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সময় নষ্ট করছেন। বলছি, হেঁদোতে কি কারও সঙ্গে আপনার গোপন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল?

তা ছিল বই কি! বিকেলের দিকে আমার বেয়াইমশাইও ওখানে রোজ আসেন কিনা।

বেয়াইমশাই! হাসালেন মশাই। বেয়াইয়ের সঙ্গে কারও অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকে বলে শুনিনি। তবে যাই হোক, লোকটা শেষ পর্যন্ত আসেনি। হয়তো কিছু টের পেয়ে সাবধান হয়েছে।

বাঃ, আপনার অনুমান তো দিব্যি ভালো।

আপনি বললে তো হবে না। ওপরওয়ালা যে খুশি হয় না। যাকগে, তারপর মিনিট কুড়ি বাদে আপনি হেঁদো থেকে বেরিয়ে ফের হাঁটা ধরলেন। বিডন স্ট্রিটের একটা মনোহারি দোকানে ঢুকে নানারকম জিনিসপত্র দেখতে লাগলেন। স্যান্ডউইচ ব্লেড, টমেটো সস, ধূপকাঠি, কাসুন্দির শিশি, ফিনাইল, যত সব আলতু ফালতু জিনিস।

ওরে বাপ। আপনার চোখ তো সাংঘাতিক!

তবে? ফলো করা কি চাট্টিখানি কথা! চারদিকে চোখ রাখতে হয়। কিন্তু সেই দোকান থেকে আপনি পাঁউরুটি ছাড়া আর কিছুই কিনলেন না। বিবেকানন্দ বেকারির এক পাউন্ডের একটা রুটি, তাই না?

খুব ঠিক।

বিবেকানন্দ বেকারির মিল্ক ব্রেড আমারও বেশ প্রিয়।

তাই নাকি? তাহলে তো আপনার সঙ্গে আমার বেশ মিল!

না মশাই, না। আপনি টার্গেট, আমি আপনার শ্যাডো। সম্পর্কটা খুব বন্ধুত্বের নয়। যাক, রুটি কিনে আপনি আরও খানিকটা হাঁটলেন। হেঁটে একটা বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে কড়া নাড়ালেন। একজন বউমতো মহিলা দরজা খুলতেই তাকে জিগ্যেস করলেন, অভয় বাড়ি আছে? বউটি বলল, না, বার্নপুর গেছে।

তাও শুনেছেন?

হ্যাঁ। বুঝতে পারলাম না, অভয়ের সঙ্গে আপনার সম্পর্কটা কী? হতে পারে, এই অভয়ই আপনার সহ-ষড়যন্ত্রকারী।

মন্দ বলেননি। কথাটা ভেবে দেখতে হবে। তবে এমনিতে অভয় আমার পুরোনো কলিগ।

তা তো বলবেনই। সত্যি কথা কি এত সহজে বের করা যায়?

সে তো বটেই। কিন্তু সত্যি কথাটা কী তা কি আন্দাজ করেছেন?

তা আর করিনি! গভীর ষড়যন্ত্র মশাই, গভীর ষড়যন্ত্র। অপরাধবিজ্ঞানে বলা আছে, প্রকৃত ভয়ংকর অপরাধীদের বাইরের আচরণ দেখে তাদের মতলব বোঝা অসম্ভব। একজন খুনিকে হয়তো বাইরে থেকে খুবই নিরীহ বলে মনে হয়। আপনাকে দেখেও আমার অনুমান, আপনি অপরাধ জগতের খুব উঁচুদরের খেলোয়াড়। টোস্ট, কফি খাওয়া, সাঁতার দেখা, পাঁউরুটি কেনা বা অভয়ের খোঁজ করা এসবের মধ্যেও একটা গভীর অপরাধপ্রবণ মন নীরবে কাজ করে যাচ্ছে। কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না, ধরা যাচ্ছে না।

চমৎকার! তারপর কী হল?

হ্যাঁ, অভয়কে না পেয়ে আপনি হঠাৎ ডানদিকের একটা গলিতে ঢুকে গেলেন। সেই দুলকি চালে হাঁটা, কোনও উদ্বেগ বা তাড়াহুড়ো নেই। হাঁটতে-হাঁটতে বড় রাস্তায় এসে আপনি একটা বুক স্টলের সামনে দাঁড়ালেন। ঠিক কিনা?

হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক।

বুক স্টলে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পাঁউরুটিটা বগলে চেপে ধরে পত্র-পত্রিকা দেখতে লাগলেন। এইখানে আমার একটু আপত্তি জানিয়ে রাখি। পাঁউরুটি একটা খাবার জিনিস। সেটাকে বগলে চেপে

রাখাটা মোটেই উচিত কাজ নয়। মানুষের বগলে ঘাম এবং দুর্গন্ধ থাকেই। পাঁউরুটিটা বগলে চেপে রাখাটা কি আপনার উচিত হয়েছে?

আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। কাজটা ঠিক হয়নি। এবার থেকে ব্যাপারটা সম্পর্কে আমি সজাগ ও সতর্ক থাকব।

হ্যাঁ, আপনি স্টলে দাঁড়িয়ে মোট তিনটে পত্রিকা দেখেছেন। একটা লাইট অফ এশিয়া, একটা ইনলুকার এবং একটা বাংলা পত্রিকা স্বপ্নানন্দা। ঠিক বলেছি?

এ-পর্যন্ত আপনার সব অবজার্ভেশনই নিখুঁত। বলে যান।

ওই বুকস্টলে আপনার সময় লাগল আধঘণ্টা। আপনি বাংলা মাসিকপত্রটা কিনেও ফেললেন। সেটা এখন আপনার হাতেই রয়েছে। অবশ্য জানি না ওই পত্রিকা কেনাটাও কোনও সংকেত কিনা। ওর মধ্যেই হয়তো আপনার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার হাল হদিশ রয়েছে।

থাকতেই পারে, থাকতেই পারে। বিচিত্র কি? তারপর?

তারপর থেকে আপনি এসে এই পার্কে বসে আছেন। হয়তো এখানে আপনার সঙ্গে কারও একটা রাঁদেভু হবে। কিন্তু মশাই, সেটা আর কখন হবে? আমি তো ধৈর্য রাখতে পারছি না। সন্ধে সাতটা বেজে পাঁচ মিনিট হয়ে গেল যে!

ব্যস্ত হবেন না। কেল্লা তো প্রায় মেরেই দিয়েছেন। ওই যে দেখছেন, মোটাসোটা এক ভদ্রমহিলা এদিকে আসছেন ওঁর সঙ্গেই আমার রাঁদেভু। উনিই আমার অপারেটর। যত খুন খারাপি, স্মাগলিং আর দুষ্কর্ম আছে সব কাজ উনিই পরিচালনা করেন।

বটে!

হ্যাঁ। তবে বাইরে থেকে দেখে বুঝবেন না। হাতে শাঁখা-পলা, সিঁথিতে সিঁদূর। একেবারে গিন্নিবান্নির মতো চেহারা। কিন্তু ফুলন দেবীর চেয়েও ভয়ংকর।

সর্বনাশ! উনি কে বলুন তো?

উনিই বিদিশা দেবী। আমার স্ত্রী।

আগন্তুক

নাদুবাবু বেজায় নাকাল হচ্ছেন। মানুষটি ভালো, প্রাণে বেশ দয়ামায়া আছে। কাঙাল ভিখিরি এসে দাঁড়ালে দূর-ছাই করতে পারেন না। মাথা পিছু একটি করে আধুলি বরাদ্দ করে রেখেছিলেন। তা আগে পাঁচ-সাতজন ভিখিরি নানা সময়ে আসত। কিন্তু ইদানীং সংখ্যাটা বেড়েছে। বাড়তে-বাড়তে গতকাল দাঁড়িয়ে গিয়েছিল ত্রিশ জন।

আজ সকালে নিজের ছোট মনোহারির দোকানটা খুলে ধূপধুনো জ্বেলে গণেশবাবাকে পেন্নাম করে মুখ তুলে দেখেন, ওরে বাবা! দোকানের সামনে অন্তত জনা পঞ্চাশেক ভিখিরির লাইন। এই ফরাসগঞ্জে কোনওকালে এত ভিখিরি ছিল না! এল কোত্থেকে?

নাদুবাবু হাতজোড় করে বললেন, বাবা সকল, মা জননীরা, আজ আর আধুলিতে কুলোতে পারব না। একখানা করে সিকি নিয়ে যাও।

শুনে ভিখিরিরা বেজায় চেঁচামেচি জুড়ে দিল। একজন তো তেড়িয়া হয়ে বলে উঠল, এঃ, সিকি দেখাচ্ছেন? আমরা কি ভিখিরি নাকি?

তা গেল পঁচিশটা টাকা। নাদুবাবুর মুশকিল হল তিনি মোটেই রোখাচোখা মানুষ নন, স্পষ্টবক্তা নন, নিরীহ আর ভীতুও বটেন। ভিখিরিরা বিদেয় হল তো সুধীরবাবু এসে হাজির। রোজই হাজিরা দেন। টুকটাক জিনিস কেনেন। বলেন, খাতায় লিখে রাখো,

মাসকাবারে দিয়ে যাব। তা আজ অবধি কত মাস যে কাবার হল তার হিসেব নেই। কিন্তু সুধীরবাবু ধারের একটি পয়সাও শোধ দেননি। টাকা না-দিলেও সুধীরবাবু উপদেশ দিয়ে থাকেন।

আজ বললেন, ওহে নাদু, তোমার ব্যাবসার যে উন্নতি হচ্ছে না তার কারণ কি জানো? তোমার স্টকটা মোটেই সুবিধের নয়। ওরে বাপু, এ যুগে ভালো-ভালো জিনিস দিয়ে দোকান না সাজালে কি খদ্দের আসে? ভালো-ভালো ব্র্যান্ডের জিনিস কই তোমার? বিলিতি বিস্কুট, ফরাসি সেন্ট, জার্মান ব্লেড এসব না রাখলে এ দোকানের কোনও ভবিষ্যৎ নেই।

সেটা নাদুবাবুও জানেন। সুধীরবাবুর মতো আরও কয়েকজন খদ্দের আছে তাঁর। লক্ষ্মীরতন রায়, গগন চাটুজ্যে, মাধব কর্মকার। এরা সব মাতব্বর লোক। সুধীরবাবুর তবু একটু বিনয় আছে, এদের তাও নেই। যা খুশি জিনিস তুলে নিয়ে যায়। দাম শোধ দেওয়ার নামও করে না। নাদুবাবু লজ্জার মাথা খেয়ে তাগাদাও দিতে পারেন না কখনও।

তাঁর বউ নবলীলা এমনিতেই খাণ্ডার! তার ওপর নাদুবাবুর এইসব ভালোমানুষী আর আহম্মকি দেখে রোজ উস্তম-ফুস্তম করে দিনরাত বকাঝকা-গালমন্দ করে থাকেন। তা নাদুবাবু সে সবেরও কোনও সদুত্তর খুঁজে পান না।

তবে ফরাসগঞ্জের সব লোকই কিন্তু খারাপ নয়। তারা জানে নাদু সরকার নিরীহ সজ্জন মানুষ। দাম বা ওজনে কখনও ঠকায় না। তাই এই দোকানের কিছু বাঁধা খদ্দের আছে। তাদের ভরসাতেই নাদুবাবুর গ্রাসাচ্ছাদনটা কোনওরকমে চলে যায়।

একটু বেলার দিকে সুধীরবাবু বিদেয় হলেন। নাদুবাবু একা-একা বসে নিজের দুঃখের কথা ভাবতে লাগলেন।

এরপর দুটো-চারটে খদ্দের এল, দু-একজন কুশলপ্রশ্ন করে গেল। রমাকান্ত পুরুত এসে শান্তিজল ছিটিয়ে কপালে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে দুটো টাকা নিয়ে গেল। তারপর খানিকক্ষণ ফাঁকা সময় যাচ্ছিল। তখন দুটো কুকুরের ঝগড়া লাগল রাস্তায়। কিছুক্ষণ ঝগড়াটা দেখল বসে নাদু সরকার। গাঁ দেশে দেখার আছেটাই বা কি!

দুপুরের দিকে যখন নাদুবাবু উঠি-উঠি করছেন, ঠিক সেই সময় একটা হা-ঘরে চেহারার লোক এসে টপ করে উঠে সুধীরবাবুর পরিত্যক্ত টুলটায় বসে পড়ে বলল, বিড়ি আছে হে?

নাদুবাবু বললেন, না। বিড়িটিড়ি আমি রাখি না। ওসব হরির দোকানে পাবেন। বাঁ-হাতে একটু এগিয়ে যান, এই কদমতলার দিকে।

না হে, বিড়ির দরকার নেই। ওসব আমি খাই না।

তবে চাইলেন যে।

চাইনি তো! বললুম, বিড়ি আছে হে! তার মানে তো চাওয়া হয়!

তা বটে, তবে এরকমটাই মানে হয় আর কি!

জানতে চাওয়া আর চাওয়া কি এক হল বাপু?

নাদুবাবু মাথা নেড়ে বললেন, তা অবিশ্যি ঠিক।

লোকটা আধবুড়ো, রোগা। গালে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, দাঁত উঁচু। পরনে ময়লা একটা সাদা পিরান, হেঁটো ধুতি আর পায়ে লালচে রঙের ক্যাম্বিসের জুতো। বেশ আয়েশ করে বসে দেওয়ালে হেলান দিয়ে চোখ বুজে আছে।

এদিকে নাদুবাবুর খিদে পেয়েছে। বাড়ি গিয়ে চান করে চাট্টি খাবেন। কিন্তু লোকটাকে তো আর বিদেয় হতে বলা যায় না।

তাই নাদুবাবু বারকয়েক ইঙ্গিতপূর্ণ গলাখাঁকারি দিলেন। তাতে কাজ হল না।

নাদুবাবু অগত্যা চুপ করে বসে করুণ চোখে দেখতে লাগলেন। লোকটার ঘুম কখন ভাঙবে তা কে জানে!

হঠাৎ লোকটা গা ঝাড়া দিয়ে সোজা হয়ে বসে বলল, ওহে, তোমার দোকানে পাঁউরুটি পাওয়া যায়?

যায়, তবে ফুরিয়ে গেছে।

আহা, ফুরিয়ে গেলে ক্ষতি কি? বলছিলাম পাওয়া যায় কিনা। আমার দরকার নেই, স্রেফ কৌতূহল।

যে আজ্ঞে।

আচ্ছা, ইসবগুলের ভূষি রাখো না তুমি?

আজ্ঞে না। বাজারের মদনের দোকানে ভূষি পেয়ে যাবেন। যান না, তিন মিনিটের পথ।

আহা, ইসবগুলের ভূষি দিয়ে আমার হবেটা কি? তা তুমি খড়কে রাখো? টুথপিক?

আজ্ঞে না। গাঁ দেশে কাঠির অভাব নেই। কে পয়সা খরচ করে টুথপিক কিনতে যাবে বলুন। তবে আপনার দরকার থাকলে—

আরে না-না। খাবারই জুটছে না তো খড়কে দিয়ে কী হবে?

কথাটা শুনে নাদুবাবুর একটু কষ্ট হল। তাঁর বড় দয়ার শরীর। বললেন, খাওয়া হয়নি বুঝি আপনার?

লোকটা মাথা নেড়ে বলে, না হে বাপু। গত দিন দুয়েক খাদ্যবস্তুর সঙ্গে মোটে দেখা-সাক্ষাৎই হচ্ছে না।

নাদুবাবু চিন্তায় পড়ে গেলেন। দু-দিনের উপোসী মানুষটাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে পেট পুরে খাওয়াতে ভারি ইচ্ছে করছে।

কিন্তু তাঁর বউ নবলীলা বড্ড মাথা গরম মানুষ যে! এমনিতেই তিনি নাদুবাবুকে মোটেই ভালো চোখে দেখেন না। অকারণেই ঝেড়ে কাপড় পরান। তার ওপর অসময়ে অতিথি নিয়ে গিয়ে হাজির হলে বারুদে আগুন লাগবে যে!

তাই আমতা-আমতা করে বললেন, তা ইয়ে, বিস্কুট খেয়ে দেখবেন? ভালো বিস্কুট আছে কিন্তু! কয়েকখানা খেয়ে একটু জল খাওয়ার পর খিদে জব্দ হয়ে যাবে।

লোকটা মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে বলল, বিস্কুট! ছো! ও আমি জীবনে খাইনি। বিস্কুট আর কাঠের গুঁড়োয় তফাত কী বলো তো! ওসব ফিনফিনে জিনিস আমি দু-চোখে দেখতে পারি না।

নাদুবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, তাহলে আর কী করা, আমার কাছে তো বেশি নেই। এই দশটা টাকা নিয়ে যান। যা হোক কিছু কিনেটিনে খাবেন।

দশ টাকা? বলে লোকটা ভারি অরুচির সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলে, দশ টাকা আবার টাকা? ও তুমিই রেখে দাও।

অপ্রতিভ নাদুবাবু অগত্যা ড্রয়ার আর পকেট হাতড়ে যা পেলেন তা গুণে নিয়ে লোকটার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, এই যে, কুড়িটা টাকা নিয়ে যান। আমার কাছে আর নেই কিন্তু।

লোকটা উদাস চোখে রাস্তার দিকে চেয়ে থেকে বলল, কুড়ি টাকায় কী হয় বলো তো এই বাজারে?

কিন্তু আমার আর নেই যে!

লোকটা নাদুবাবুর দিকে একঝলক তাচ্ছিল্যের দৃষ্টি হেনে বলল, আহা, খুঁজে দেখতে দোষ কি? আরও তিনটে ড্রয়ারের

টানা খুলে দেখোই না কিছু বেরোয় কিনা।

ওসব আমার দেখা। তবু যখন বলছেন তখন দেখছি। কিন্তু কিছু নেই, আগেই বলে রাখছি।

নাদুবাবু দ্বিতীয় ড্রয়ারটা খুলে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করতে গিয়ে হঠাৎ দেখলেন তিনখানা পাঁচশো টাকার নোট এক জায়গায় পড়ে আছে। তাজ্জব হয়ে টাকাটা বের করে চেয়ে রইলেন। বললেন, ও বাবা! এ তো দেখছি দেড় হাজার টাকা? কবে মনের ভুলে রেখেছিলাম কে জানে! তা আপনার কপালেই যখন পেলাম, তখন এ টাকাও আপনি নিয়ে যান।

লোকটা দেড় হাজার শুনেও তেমন উৎসাহ দেখাল না। ঠোঁট উলটে বলল, দেড় হাজার তো ফুঁয়ে উড়ে যায়। ওহে বাপু, আরও তলিয়ে দেখো। ভালো করে খুঁজলেই না তুমি। আরও দুটো ড্রয়ার তো পড়ে রইল। কোন কাগজের ভাঁজে কী আছে তা কি বলা যায়?

নাদুবাবু তাড়াতাড়ি তৃতীয় ড্রয়ারটাও খুললেন। মেলা কাগজপত্র দিয়ে ঠাসা ড্রয়ারটা। খুঁজতে-খুঁজতে পুরোনো ক্যাশমেমোর বইয়ের ফাঁক থেকে আরও হাজার দুই টাকার ন্যাতানো নোট বেরিয়ে পড়ল। নাদুবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, অশৈলী কাণ্ডই বটে! এ যে দু-হাজার টাকা! নাঃ, আপনার কপালটা ভালোই বলতে হবে।

দূর! দূর! ও আর এমনকী? আঁতিপাঁতি করে দেখো হে! দেখার চোখ থাকলে কত কী বেরিয়ে আসে!

তা, বলতে নেই, বেরোলোও। গুনে গেঁথে নাদুবাবু অবাক হয়ে দেখলেন, মোট পাঁচ হাজার। এত টাকা বহুকাল একসঙ্গে দেখেননি তিনি। একটা শ্বাস ফেলে বললেন, না মশাই, এ

অবিশ্বাস্য কাণ্ড। তা আপনার কথাতেই যখন পাওয়া হল, তখন এ টাকা আপনাকেই দিচ্ছি। নিন।

লোকটা ভারি বিরাগের সঙ্গে মাথা নেড়ে বলে, টাকাপয়সা দিয়ে আমার হবেটা কি? আমি কি তোমার কাছে চেয়েছি নাকি?

আপনিই তো খুঁজতে বললেন!

লোকটা মাছি তাড়ানোর মতো হাত নেড়ে বিরক্ত গলায় বলে, খুঁজতে বলেছি বলেই কি টাকা নিতে হবে নাকি?

আহা, আপনার খিদে পেয়েছে বলছিলেন যে!

লোকটা খিঁচিয়ে উঠে বলে, তাতে তোমার কী? আমার খিদে নিয়ে তোমায় ভাবতে বলেছে কে? পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে খুব গুমোর হয়েছে দেখছি! আমাকে টাকা দেখাচ্ছ।

নাদুবাবু কাঁচুমাচু হয়ে বললেন, আপনি রাগ করবেন না। আচ্ছা, আপনি কি অন্তর্যামী?

কোন দুঃখে অন্তর্যামী হতে যাব?

আমতা-আমতা করে নাদুবাবু বললেন, না, আপনার যা দূরদৃষ্টি দেখছি তাতে মনে হল আর কী?

লোকটা উঠে পড়ল। বলল, চারদিকে নজর রেখে চলতে হয় বাপু। আর সেই কথাটাই বলার জন্য আসা। আমার কথা হয়ে গেছে, চললুম।

বলে লোকটা দোকান থেকে বেরিয়ে হনহন করে ছুটে চলে গেল।

নাদুবাবুর চোখ গোল, মুখ হাঁ।

একান্ন টাকা

খাঁদু মল্লিকের কাছে মদন বৈরাগীর একান্ন টাকা ধার ছিল। দেখ না দেখ ছ'মাস কেটে গেছে। টাকাটা এখনও মদনের জোগাড় হয়নি। খাঁদুর সুদ খুব চড়া। দু-মাস আগে নফরগঞ্জে শুনে এসেছিল, একান্ন টাকা নাকি চার মাসে সুদে-আসলে তিরাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সায় দাঁড়িয়েছে। কত হারে সুদ সেটা মদনের ধারণাও নেই। অঙ্কের নামগন্ধ সে জানে না, সুদক যা দূরে থাক। যাই হোক খাঁদু মল্লিকের টাকাটা কিছুতেই শুধে উঠতে পারছে না সে। দশ টাকা রোজগার হলে ন'টাকা খরচ। একান্ন টাকা দু-মাস আগে তিরাশি টাকা পঞ্চাশ পয়সায় দাঁড়িয়েছিল বটে, কিন্তু গত দু-মাসে খাঁদু তাকে কোথায় ঠেলে তুলেছে কে জানে।

নফরগঞ্জ থেকে পীর নসিবপুর মোটে দু-মাইল রাস্তা। মদন নফরগঞ্জে গেলে যেমন খাঁদুর খবর পায়, তেমনি খাঁদুর কাছেও খবর পৌঁছে যায়। মদন ভয়ে আর পীর নসিবপুরের রাস্তা মাড়ায় না বটে, কিন্তু সে জানে, গা-ঢাকা দিয়ে বেশিদিন খাঁদুর হাত থেকে বাঁচা যাবে না।

নফরগঞ্জের আটাচাক্কির পিয়ারী নস্কর মদনকে চক্রবৃদ্ধি সুদ জিনিসটা কি তা দুপুরবেলায় বোঝাচ্ছিল। মদন ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝল না বটে, কিন্তু ব্যাপারটা যে ঘোরালো হয়ে উঠেছে তার একটা আন্দাজ হল। ধূপ বেচে তার গোটা বিশেক টাকা

নীট মুনাফা হয়েছে, কিন্তু পিয়ারী বলল, একটু একটু করে দিয়ে কোনও লাভ নেই। ওতে আরও সুদটা তেড়েফুঁড়ে ওঠে। পারো তো বাপু গোটাটাই একদিন ঝপ করে ফেলে দাও।

মদন ভাবিত হল। কারও কারও কাছে একান্ন টাকা মোটে টাকাই নয় বটে, কিন্তু ধূপ আর ধূপকাঠি বেচে মদনের যা আয় হয় সেই হিসেবে একান্ন টাকা পর্বতের সমান।

অঘোর মান্না মদনের কাছ থেকে পাঁচ প্যাকেট 'চন্দন শলাকা' নিল। অঘোর বেশ লোক, নগদা-নগদি মিটিয়ে দেয়, ঘোরায় না। বলল, তা তোর সুদে-আসলে শুনলুম একশো ছাড়িয়েছে। পরশু খাঁদু এসেছিল আলকাতরা কিনতে। তখনই কথা হল।

মদনের বয়স এই সাতাশ পুরল। তবু কথাটা শুনে নিজেকে ভারী জবুথবু বুড়ো মানুষ বলে মনে হচ্ছিল তার। একটা দীর্ঘশ্বাসও বেরিয়ে গেল তার। দুনিয়ার খেল বোঝা দুষ্কর। একান্ন যে-কোনও মন্তরে একশো ছাড়িয়ে গেল কে জানে।

একান্নটা টাকা যে মানুষের কত বড় শত্তুর হতে পারে তা এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে মদন। রাতে খারাপ স্বপ্ন দেখছে, মাঝে মাঝে বুকটা ধকধক করে উঠছে, জিব শুকোচ্ছে।

নফরগঞ্জে আজ হাটবার। গাঁ-গঞ্জ থেকে হাট প্রায় উঠেই যাচ্ছে। ময়রাদীঘির হাট বিখ্যাত ছিল। এখন পাকা বাজার হওয়ার পর থেকে হাট বসছে না। বসবেই বা কোথায়? ফাঁকা মাঠ ভরাট হয়ে বাড়িঘর উঠে পড়ছে। চারদিকেই বেশ উন্নতির লক্ষণ দেখছে মদন, শুধু তারই তেমন কিছু হয়ে উঠছে না। নোনাপুকুর গাঁয়ে তার একখানা পৈতৃক ভদ্রাসন আছে মাত্র। টিনের ঘর দুখানা, একটা দাওয়া, এক চিলতে উঠোন। মা-বাবা পটল

তুলেছে কবেই, একাবোকা মদনই ভিটে কামড়ে পড়ে আছে। তিন কুলে আর কারও খবর জানা নেই তার। কেউ তার খবরও কস্মিনকালে নেয় না। লেখাপড়া একটু শিখেছিল, অঙ্কের জন্যই উঁচু ক্লাসে উঠতে পারল না। দু-এক ক্লাস উঁচুতে উঠেই দেখেছে, অঙ্ক যেন বনবেড়াল থেকে হালুম-বাঘা হয়ে উঠেছে। লেখাপড়া করতে হলে পিছনে হুলো দেওয়ার কাউকে চাই। তা সেরকম কেউ তো ছিল না তার যে, তাড়ন-পীড়ন করে বাবা-বাছা বলে পড়তে বসাবে।

হাটে আজ ভিড় মন্দ হয়নি। মেলা ব্যাপারি, মেলা খদ্দের। মদন তার দুখানা হাতব্যাগ নিয়ে হাটের ধারে বটতলায় বসে গেল। পাশেই সেফটিপিন-চিরুনি-বোতাম-ডটপেন-ওয়ালা সতু শিট। ওপাশে কুড়ি টাকায় এক সেট ঘড়ি-লাইটার-চিরুনি-পেনসিল টর্চওয়ালা পটল-ডাঙার হরিশ পাল। ওদের তবু খদ্দের আছে। মদন প্লাস্টিকের সবুজ চাদরটা পেতে ধূপকাঠি আর ধূপের প্যাকেট সাজাতে লাগল।

হরিশ বিক্রিবাটার মাঝখানেই বলল, একজন বুড়ো মানুষ তোর খোঁজ করছিল রে মদনা? খিটকেলে বুড়ো।

মদন হাসল। কে খিটকেলে নয় বাবা! দু-টাকা চার-টাকায় সস্তা মাল কিনবে, তায় আবার নানা বায়নাক্কা। কিন্তু ব্যবসা করতে গেলে ওসব সয়ে নিতে হয়।

তার চন্দন শলাকা আর রানি ধূপ মন্দ বিকোয় না। চন্দন শলাকাটা সে নিজেই বানায়। বাকিগুলো পাইকারের কাছে কেনে। নোনাপুকুরের ধীরেন গোঁসাইয়ের সুগন্ধী ওয়ার্কস-এর মালও আছে কয়েক রকমের। দোকান খুলতেই আজ চার প্যাকেট মশার ধূপ, পাঁচ প্যাকেট চন্দন শলাকা বিক্রি হয়ে গেল। বউনি খারাপ

হয়নি, কিন্তু এই বিক্রিবাটায় পেটটা হয়তো চালিয়ে নেওয়া যায়, খাঁদু মল্লিকের চক্রবৃদ্ধির সুদ মেটানো কি ইহজন্মে সম্ভব?

খিটকেলে বুড়োটা এল। গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবি, হেঁটো ধুতি, পায়ে হাওয়াই।

এই যে বাপু, তুমি বলেছিলে, ধূপ পছন্দ না হলে পয়সা ফেরত।

মদন বলে, সে তো ঠিক কথা।

এই যে রাতের রানি ধূপকাঠি দিয়েছো, পাঁচ টাকায় কেনা, এর গন্ধে বাড়িতে টেকা যাচ্ছে না। দুটো কাঠি কিন্তু খরচা হয়েছে।

মদন অম্লান মুখে বলল, তাতে কি? দিন, ফেরত নিচ্ছি।

পুরো পয়সা ফেরত পেয়ে বুড়োটা যেন একটু হতভম্ব হয়ে গেল। পয়সা হাতে নিয়ে হাঁ করে একটু তাকিয়ে রইল মদনের দিকে। তারপর অবাক ভাবটা গিলে একটু দোনোমোনো করে হাটবাগে হাঁটা দিল।

সতু শীট বলল, এরকম পয়সা ফেরত দিস বলেই ব্যবসা লাটে উঠেছে তোর। পয়সা ফেরত না দিয়ে অন্য কোনও ব্র্যান্ড গছাতে পারিস তো!

আরে না। ওসব করলে লোকে খুশি হয় না।

খুশির যা নমুনা দেখছি!

যে যাই বলুক মদন তার নিয়ম মেনেই চলে। পছন্দ না হলে পয়সা ফেরত কবুল করেও খদ্দেরকে ঘোরানো সে পছন্দ করে না। ফেরত-এর কেস তার খুব কমই হয়।

বিষ্ণুপদ মণ্ডল পয়সাওয়ালা লোক। নজরও উঁচু। বটতলাব হকারে কাছ থেকে জিনিস কেনার পাত্রই নয়। আজ কী ভেবে

কে জানে, বটতলায় দাঁড়িয়ে গেল। তারপর মদনের কাছেই এগিয়ে এসে বলল, তোমার না চন্দন শলাকা বলে একটা ধূপকাঠি আছে?

মদন সন্ত্রস্ত হয়ে বলল, আজ্ঞে আছে। আমার নিজের তৈরি।

বটে! ভালো ভালো। সেদিন আমার চাকর শশী নিয়ে গিয়েছিল এক প্যাকেট। আমার গিন্নির সেটা খুব পছন্দ হয়েছে। তা কয় প্যাকেট এনেছো?

তা অনেক আছে, বিশ-পঁচিশ প্যাকেট।

দিয়ে দাও।

বিস্মিত মদন বলে, সব কটা?

হ্যাঁ। সব কটা। কত প্যাকেট?

এমনিতে চার টাকা। তবে একসঙ্গে পাঁচ প্যাকেট নিলে সাড়ে তিন টাকা।

কনসেশন লাগবে না। চার টাকা করেই দেব। পরের বার আরও একটু বেশি করে এনো। আমার সুধা স্টোর্সে রাখবখন। আর একটা কথা বাপু, জিনিসের দাম কম করলেই যে বিক্রি হবে তা কিন্তু নয়। আজকাল লোকের পকেটে পয়সা এসেছে। কম দামের জিনিস লোকে সন্দেহের চোখে দ্যাখে। প্যাকেজিংটা ভালো কোরো, তাহলে লোকে নেড়েচেড়ে দেখবে। দেখতে ম্যাড়ম্যাড়ে হলে লোকে ছুঁতে চায় না।

একসঙ্গে সাতাশ প্যাকেট চন্দন শলাকা বেচে মদন একটু থতমতই খেয়ে গেল। টাকাও হল মন্দ নয়। এই ধূপকাঠিটা সে নিজের হাতে যত্ন করে তৈরি করে। লাভ তাতে বেশিই হয়। প্যাকেটে দু-টাকার মতো। হিসেব করলে শুধু চন্দন শলাকাতেই তার নিট লাভ চুয়ান্ন টাকা।

সতু বলল, হাঁ করে ভাবছিস কী?

ভাবছি, একটু সিঙাড়া জিলিপি খাব।

সতু হাসল, বড় খদ্দের বরাত দিয়ে গেল বুঝি?

বাপ রে! বিষ্ণুপদ মণ্ডল বলে কথা!

দেখ, কতদিন নেয়। তবে তুই তো বোকা। চার টাকায় ছাড়লি। বিষ্ণুপদ কম করেও দশ টাকা প্যাকেট বিক্রি করবে। খোঁজ নিয়ে দেখিস।

তা মদনের আজ জিলিপি-সিঙাড়াও হল। এখন খাঁদু মল্লিকের টাকাটা শোধ হলেই হয়। ওটা গলার কাঁটা হয়ে আছে।

দিনান্তে মোট পঁচাত্তর টাকা নাফা হল মদনের। একটু আশার আলো দেখতে পাচ্ছে সে। বিষ্ণুপদ যদি চন্দন শলাকা নিয়মিত নেয় তাহলে সে মালমশলা কিনে একটু বেশি মাল তৈরি করতে শুরু করবে। খাঁদু মল্লিকের ধারটা শোধ হলেই সে হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে পারে। ওই ধারটা তার গলার কাঁটা হয়ে আছে।

জিনিসপত্তর ব্যাগে ভরে প্লাস্টিকের চাদরটা গুটিয়ে উঠতে যাচ্ছে মদন, ঠিক এমন সময় সেই খিটকেলে বুড়োটা এল। মুখে একটু হাসি।

মদন ভদ্রতা করে বলল, কিছু বলবেন?

বুড়ো মানুষটা একটু আমতা আমতা করে বলল, বলছিলাম কি, দোকানদারদের সঙ্গে আমি এই বুড়ো বয়সে আর পেরে উঠি না বাবা। বয়স হয়েছে তো, কেনাকাটা করতে গিয়ে ভুলভ্রান্তি হয়। বাড়িতে ফিরে বকুনি খাই। জিনিস ফেরত দিতে এলে দোকানদাররা বড্ড মুখঝামটা দেয়, দাঁত খিঁচোয়। একমাত্র তুমিই দেখলাম, হাসিমুখে ভাঙা প্যাকেট ফেরত নিয়ে পুরো পয়সা ফেরত দিলে।

ও কিছু নয় মশাই, খদ্দের হল লক্ষ্মী। পারতপক্ষে তাদের চটাতে নেই।

সে আর ক'জন বোঝে বলো। তা তুমি থাকো কোথায় বাপু?

আমার বাড়ি সেই নোনাপুকুর। বাসে গেলে ধোকরহাটিতে নেমে দু-মাইল হাঁটা পথ।

বাড়িতে কে আছে?

আজ্ঞে হাওয়া-বাতাস ছাড়া আর কেউ নেই।

বুড়ো লোকটা গম্ভীর হয়ে বলে, তা হাওয়া-বাতাসই বা খারাপ কি? সে-ও ফ্যালনা জিনিস নয়। বিনি-মাগনা পাওয়া যায় বলে কদর নেই।

মদন ঘাড় কাৎ করে বলে, তা বটে।

তা বাপু, আজ লাভটা কীরকম হল?

মদন একগাল হেসে বলে, তা মশাই, মোট পঁচাত্তর টাকা হয়েছে। একদিনে প্রায় সাতদিনের রোজগার। ভাসাভাসি কাণ্ড যাকে বলে।

তুমি লোকটা তো খারাপ নও। লাভ আরও হবে। ধারটাও শোধ হয়ে যাবে।

মদন অবাক হয়ে বলে, ধার! কোন ধারের কথা বলছেন?

লোকটা অপ্রস্তুত হয়ে বলে, বুড়ো মানুষের কথা ধোরো না বাবা। উলটো-পালটো বলে ফেলি। ধারকর্জ নেই তো?

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মদন বলে, আছে মশাই, একান্ন টাকা নাকি সুদে-আসলে একশো দাঁড়িয়েছে।

একশো সতেরো টাকা।

অ্যাঁ! আপনি জানলেন কী করে?

আমি! না আমি জানি না কিছু। এইরকমই কি যেন বাতাসে

শুনতে পেলাম। মাস গেলে একশো বিয়াল্লিশে দাঁড়াবে।

মদনের একগাল মাছি। বলে কি লোকটা?

লোকটা ভারি আনমনে অন্যদিকে চেয়ে বিড়বিড় করে বলল, শোধ হয়ে যাবে বাবা। তার পরও অনেক থাকবে। শুধু নিজেকে ভুলে যেও না।

চোখের পলকে লোকটা ভাঙা হাটের ভিড়ের মধ্যে মিশে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল।

মদন ভারি অবাক হয়ে ভাবতে-ভাবতে বাস ধরে বাড়ি ফিরল।

কিন্তু তিন মাসের মধ্যে খাঁদু মল্লিকের ধার শোধ হয়ে হাজার পাঁচেক টাকা মূলধন দাঁড়াল মদনের। চন্দন শলাকা ছাড়াও সে কস্তুরী শলাকা, যূথিকা শলাকা, গোলাপ শলাকা, মল্লিকা শলাকা বের করেছে। মাল বাজারে পড়তে পায় না। দেদার বিক্রি। চারজন কর্মচারী রাখতে হল তাকে। ভাসাভাসি কাণ্ডই বটে। ফিরি করতে হয় না, বাড়ি থেকেই বিক্রি হয়ে যাচ্ছে আজকাল।

শুধু মাঝে মাঝে বুড়ো মানুষটার কথা মনে হয় তার। নিজেকে ভুলতে বারণ করেছিল। মদন বিড়বিড় করে বলে, না ভুলব না। ভুলব না।

চকবেড়ের গোহাটায়

চকবেড়ের গোহাটায় গরু কিনতে গিয়েছিল পানাই মণ্ডল। চকবেড়ে অঞ্চলটা তেমন চেনা নয় তার। যাতায়াতই নেই। তবে নামটা জানা ছিল। আর এই গোহাটাই পরগনায় সবচেয়ে বড়। তার বউ বলে দিয়েছে, ওগো, আজকাল যেস সব হাতির মতো বড় বড় জারসি গরু, পাঞ্জাবি গরু বেরিয়েছে ওগুলো কিনো না। ওই বিরাট গরু দেখলে বাপু ভয় করে। একটা লক্ষ্মীমন্ত দেখে দিশি গরু কিনে এনো।

পানাই মণ্ডল গরুর মর্ম তেমন জানে না। এতকাল গাইগরু পোষার মতো অবস্থাই ছিল না তার। পর পর বছর চারেক ভালো বর্ষা হওয়ায় চাষটা কপালজোরে ভালোই হয়েছিল। তার ওপর নিমাই নস্কর নামে একটা চাষবাসে পাশ করা ছোকরা এসে তাকে অকালে ফসল ফলনো শিখিয়েছে। সেইসব করে হাতে কিছু বাড়তি পয়সা চলে এল। তাইতেই পাকা ঘর হল, একটা টিউবওয়েল বসাল, শ্যালো কিনে ফেলল, বউ ফুলুরানি বায়না ধরল গরু না রাখলে বাড়ির লক্ষ্মীশ্রী আসে না। অতএব গরু একটা চাই।

তা সে আর বেশি কথা কি! ট্যাঁকে টাকা নিয়ে পানাই অগত্যা গোহাটায় চলে এসেছে। মুশকিল হল গরু সে ভালো চেনে না। আর জমি চাষ হয় ভাড়া করা ট্র্যাকটরে! সুতরাং বলদ রাখারও ঝামেলা পোয়াতে হয়নি কোনও দিন। অভিজ্ঞতা

না থাকলে ঠকে যাওয়া আর বিচিত্র কি। সেই জন্য একজন জানবুঝওয়ালা লোককে সঙ্গে আনবে ভেবে পীতাম্বরকে ধরেছিল। কিন্তু পীতাম্বরের শাশুড়ির এখন-তখন অবস্থা খবর পেয়ে সে জলেশ্বরে চলে গেছে। পানাই সুতরাং তার বড় শালা ঝিকুকে নিয়ে এসেছে। কিন্তু ঝিকু বলল, জামাইদা, গরুর বিষয়ে আমার তেমন জ্ঞানই নেই।

তবু দুই আনাড়িতেই এসেছে আজ।

চকবেড়ের গোহাটায় ঢুকে তাদের চোখ চড়কগাছ। সমস্ত জায়গাটা গরু গরু গন্ধে একেবারে ভোঁ-ভোঁ করছে। তেমনই ধুলো উড়ছে। গোবর আর গোচোনায় একেবারে নান্দিভাস্যি ব্যাপার। তার সঙ্গে হাজারে বিজারে মাছি আর পোকামাকড় একেবারে ঝেঁপে ধরেছে চক্করটাকে।

ঝিকু নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বলে, ওরে বাবা এ তো দেখছি নরক গুলজার!!

শুধু গরু নয়। নামে গোহাটা হলেও পাঁঠা-ছাগলের ব্যাপারীরাও বিস্তর জড়ো হয়েছে। সুতরাং দিশাহারা অবস্থা। বিস্তর খদ্দেরেরও আগমন ঘটেছে। ব্যাপার দেখে একটু ঘাবড়ে গিয়ে পানাই বলে ওরে ঝিকু, এ তো আমাদের বাঁশবনে ডোম কানা অবস্থা রে! কেউ কি আর আমাদের পাত্তা দেবে?

ঝিকু আনাড়ি হলেও চালাক-চতুর। তার ওপর বিএ পাশ করে এমএ পরীক্ষার জন্য তৈরি হচ্ছে। বলল, লোকে যেন আনাড়ি বলে বুঝতে না পারে।

ঘোরাঘুরি করতে-করতেই হঠাৎ একটা বেঁটেমতো লোক জুটে গেল সঙ্গে। ভারী মোলায়েম গদগদ ভাব। চোখে ধূর্তামি। খুব

মাখো মাখো গলায় বলল, গরু কিনবেন নাকি কর্তা? আমি হলুম গে লালমোহন, লোকে বলে গরুর জহুরি। তা কী গরু চাই? পছন্দসই যদি কিনিয়ে দিতে পারি তাহলে ওয়ান পারসেন্ট দালালি দিয়ে দেবেন।

পানাই একটু ভালো মানুষ গোছের, হয়তো রাজি হয়ে যেত, কিন্তু ঝিকু ফস করে বলে বসল, ওহে বাপু, আমাদের গরু নিয়ে কারবার, নবগ্রামে আমাদের গোশালা গিয়ে দেখে এসো, চোখ ট্যারা হয়ে যাবে।

লোকটা ভড়কাল না। বলল, তা তো বটেই। গোশালা যখন আছে তখন গরু চিনবেন বইকি। তবে কিনা গোহাটায়, অনেক বড় বড় গরুর ব্যাপারীও ঘোল খেয়ে যায় কিনা। গত হপ্তায় শিবেন মান্নার মতো পাকা লোককেও এক ব্যাপারী বুড়ো গরু গছিয়ে হাওয়া হল।

পানাই একটু ভয় খেয়ে বলল, তা হলে তো খুব ভাবনার কথা হে!

তা তো বটেই। তারপর ধরুন চোরাই গরুর ব্যাপার আছে, রোগী গরুর ব্যাপার আছে, বন্ধ্যা গরুর ব্যাপার আছে। গরু নিয়ে মহাভারত হয়ে যায় কর্তা। গত বিশটি বছর এই গোহাটার সঙ্গে লেপটে আছি। গো শাস্ত্র এখনও পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারিনি।

পানাই মণ্ডল বলল, তা তো বটেই।

ঝিকু বলল, ঠিক আছে, ভালো গরু দেখিয়ে দেবে চলো। ভালো গরু যদি সস্তায় পাই তাহলে দালালি নয় বাপ পঞ্চাশটা টাকা দিতে পারি।

লালমোহন মাথা নেড়ে বলে, ৲ হবে না কর্তা। অত কমে

পেরে উঠব না। দালালি করে খাই, আমরাও ঘরে বালবাচ্চা আছে, খরচাপাতি আছে, এই দালালিই সম্বল। আরও জনা কুড়ি দালাল নানা এলাকা ভাগ করে কাজকারবার করছে, লড়ালড়ি তো কম নয় মশাই।

গাঁইগুই করে পানাই নিমরাজি মতো হল। ঝিকু সঙ্গে বিস্তর দরাদরি করে হাফ পারসেন্টে রাজি করাল।

তবে লালমোহন লোকটা বেশ কাজের। প্রথমেই যে লোকটাকে ব্যাপারীর কাছে নিয়ে গেল সে লোকটাকে দেখলে মায়া হয়। ভারি দীন-দুঃখী চেহারা, দুটি ছোট গরু নিয়ে হাটের একটা একটেরে কোনায় সকলের চোখের আড়ালে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিল। গরু দুটোও ভারি ঠান্ডা, লোকটার মতোই।

দুটো গরুই ভারি পছন্দ হয়ে গেল পানাইয়ের। তার মধ্যে সাদায় বাদামি ছোপওয়ালা গরুটা যেন তার দিকে চেয়ে চোখের ভাষায় কিছু বলতে চাইছিল।

সে ব্যাপারীকে বলল, এটির কত দাম দেবে গো ব্যাপারী?

রোগাভোগা মানুষটা ক্ষীণ গলায় বলে, যা ভালো বুঝবেন দেবেন।

ঝিকু আর লালমোহন মাঝখানে পড়ে বিস্তর ঝামেলা পাকিয়ে তুলল। লালমোহন বলল, ছ'হাজারে ছেড়ে দাও গো ব্যাপারী।

ঝিকু ফুঁসে উঠে বলল, তার মানে? তুমি দর হাঁকবার কে হে বাপু? দালালি চাও সে পরে দেখা যাবে। দরদাম তো আমরা করব। তুমি দূরে গিয়ে দাঁড়াও।

লালমোহন বলল, এ গরুর দাম আট-দশ হাজারের নীচে নয় কিন্তু। তোমাদের ভালোর জন্যই বলছিলাম।

তোমাকে আর আমাদের ভালো দেখতে হবে না। আমাদের ভালো আমরা বেশ বুঝি।

লালমোহন যে সুবিধের লোক নয় তা বুঝে নিতে বেশি সময় লাগল না। কারণ লালমোহন বলে বসল, ব্যাপারীরা পেটের দায়ে অনেক সময় কম দামে গরু বেচে দেয় বটে, কিন্তু সেটা ধর্মত ন্যায্যত ঠিক নয়। গরুর একটা ধরাবাঁধা দাম তো আছে হে বাপু।

ঠিক এই সময়ে সবাইকে চমকে দিয়ে একটা গুরুগম্ভীর কণ্ঠ বলে উঠল, দাম চার হাজার টাকা।

লালমোহন চমকে উঠে চারদিকে চেয়ে দেখল, তারপর রুখে উঠে বলল, চার হাজার! বললেই হল চার হাজার! কে বলল কথাটা শুনি?

কিন্তু কেউ কোনও সাড়াশব্দ করল না আর।

কাঁচুমাচু মুখে গরুর ব্যাপারী পানাইকে বলল, আজ্ঞে কর্তা, ওই চার হাজার দিয়েই গরুটা নিয়ে যান। বড় ভালো গরু।

পানাই বলল, তাহলে গরুটা বেচছ কেন হে? রেখে দিলেই তো পারতে।

লোকটা মাথা নেড়ে বললে, গরু তো আমার নয় বাবু। গরুর মালিক পরমেশ্বর রায়। তাঁর গোয়ালে অনেক গরু। গরু বেশি হলে বেচে দেন। আমি হলুম তাঁর রাখোয়াল। পয়সা থাকলে আমিই কিনে নিতুন মশাই। কিন্তু আমাকে বেচলেও চার হাজার টাকা উঠবে না। তবে বলে রাখছি বাবু, গরুটা হাতছাড়া করবেন না। আপনাকে দেখলে ভালো লোক বলে মনে হয়, তাই বলছি।

লালমোহন তড়পে উঠে বলল, ও তুমি পরমেশ্বর রায়ের রাখাল! দিনে দুপুরে তাকে ঠকাচ্ছো? দাঁড়াও, আজই পরমেশ্বরবাবুর

কাছে গিয়ে তোমার নামে নালিশ জানিয়ে আসব।

ঝিকু তেড়ে উঠে বলল, তুমি কার দালাল বলো তো হে লালমোহন! আমাদের কাছে দালালি চাইছ, আর আসল দালালি করতে লেগেছ গরুর মালিকের? তুমি তো ফেরেব্বাজ লোক হে! দু-মুখো সাপ!

ফের সেই গমগমে গলাটা বলে উঠল, ও কিন্তু গরুচোর।

লালমোহন রাগে একটা লাফ দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, কে, কে বলল কথাটা? কাব এত আস্পর্দা?

কেউ অবশ্য টুঁ শব্দটিও করল না।

লালমোহন আগুন চোখে সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখে বলল, এ তল্লাটে আমার সঙ্গে শত্রুতা করে কেউ পার পাবে না। এই গোহাটায় আমার কথাই আইন। এই গরুর দাম ছয় হাজার টাকার এক পয়সা কম নয়। কিনতে হয় কেনো, নইলে কেটে পড়ো!

ঝিকু ঘুঁষি পাকিয়ে বলে, বললেই হল?

পানাই মণ্ডল ভীতু মানুষ, তাড়াতাড়ি দুজনের মাঝখানে পড়ে বলল, হাঙ্গামায় কাজ নেই বাপু, গরু আমি আর কিনছি না। গরু কেনার এত ঝামেলা জানলে কে এত দূরের গোহাটায় আসত। ঘাট হয়েছে লালমোহনবাবু, আমি গরু নেবো না।

সঙ্গে সঙ্গে সেই গুরুগম্ভীর গলায় ফের যেন দৈববাণী হল, ও গরু তোমার। নিয়ে যাও। লালমোহন পাজি লোক।

লালমোহন দিশাহারার মতো চারিদিকে চাইল। কিন্তু কথাটা কার মুখ থেকে বেরোল সেটা বুঝতে পারল না। চারদিকে বিস্তর ক্রেতা-বিক্রেতা, ফড়ে দালালের ভিড়, গোলমালে কান পাতা দায়। এর মধ্যে এই বাজ ডাকা গলায় কে মাঝে মাঝে কথা

কয়ে উঠছে তা সে বুঝতে পারছে না।

হঠাৎ মস্তানি ঝেড়ে ফেলে সে পানাইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল, দিন মশাই, ওই চার হাজার দরের কমিশনটা দিয়ে ফেলুন তো। তারপর গরু নিয়ে চলে যান।

পানাই গোলমাল এড়ানোর জন্য ট্যাঁকে হাত দিয়েছিল টাকাটা দিয়ে ফেলবে বলে। কিন্তু আচমকাই শান্ত, ছোটখাটো গরুটা এগিয়ে এসে দুম করে একটা প্রবল ঢুঁসো মেরে দিল লালমোহনকে। ডিগবাজি খেয়ে পড়ে লালেমোহন, 'বাবারে' বলে চেঁচিয়ে চোখ উলটে ফেলল।

গরুর ব্যাপারী ভারি অবাক হয়ে বলল, বড় আশ্চর্য কাণ্ড মশাই। সাবিত্রী বড় ঠান্ডা স্বভাবের গরু। কখনও কাউকে ঢুঁ দেয়নি আজ অবধি। তা যাই হোক, এসব কাণ্ড দেখে বড় ঘাবড়ে গেছি। গরু আপনিই নিন।

খুশি মনে টাকা গুনে দিয়ে গরু সাবিত্রীকে নিয়ে হাট ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল পানাই। মাঠের ভিতর হাঁটা পথ ধরে পানাই বলল, হ্যাঁরে, কাণ্ডটা কিছু বুঝলি?

ঝিকু মাথা নেড়ে বলল, না জামাইদা, অশৈলী কাণ্ড। কথাগুলো কে বলল বলো তো!

ঠোঁট উলটে পানাই বলল, কিছুই বুঝলাম না, মনে হল দৈববাণী-টৈববাণী কিছু হচ্ছে, একটু ভয়-ভয় করছে যেন।

তা আমারও কেমন যেন গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল। কিন্তু জামাইদা, চারদিকটা কেমন হঠাৎ থম মেরে গেছে দেখছ?

তাই তো রে! আকাশের রংটাও তো ভালো নয়। ঝড় আসবে বুঝি! ঘূর্ণিঝড় এলে এরকমটা হয়। এত বড় ফাঁকা মাঠে ঝড়ের মুখে পড়লে যে বিপদ হবে রে!

ছোটো জামাইদা।

ছোটার কি উপায় আছে! গরুটা রয়েছে না!

গরুটা তোমার ট্যাটন আছে জামাইদা। লালমোহনকে কেমন ঢুঁসোটা মারল বলো!

সেইটেও চিন্তার কথা রে! এত ঠান্ডা স্বভাবের গরু হঠাৎ এমন খেপে গেল কেন বল তো!

গরুটা এলেবেলে নয় জামাইদা। কিন্তু পা চালাও, ঝড়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছ? উড়িয়ে নিয়ে যাবে কিন্তু!

খোলা মাঠে ঝড়টা একেবারে উন্মাদের মতো ধেয়ে আসছিল। দূর থেকেই তার ডাকাতের মতো হাঁকার শোনা যাচ্ছিল। সঙ্গে একটা গুম গুম মেঘ ভাঙা আওয়াজ আর বাজের ঝিলিক।

হঠাৎ দড়িতে একটা হ্যাঁচকা টান পড়ায় পড়ো-পড়ো হয়ে ছুটতে লাগল পানাই। চেঁচিয়ে বললে, ঝিকু, ধর আমাকে, গরুটা পালাচ্ছে যে!

ঝিকু এসে তার একটা হাত চেপে ধরল বটে, কিন্তু আটকাতে পারল না। গরুর টানে দুজনেই প্রাণপণে ছুটতে লাগল এবড়ো-খেবড়ো মাঠের ওপর দিয়ে। প্রচণ্ড বাতাস আর ধুলোয় দিক ঠিক রইল না। একটা ছোটখাটো গরুর গায়ে যে এত জোর আর এত বেগে ছুটতে পারে সেটা তাদের বিশ্বাসই হচ্ছিল না।

কিন্তু ঝড়টা তাদের পেড়ে ফেলার আগেই গরুটা আড়াআড়ি পার হয়ে একটা পোড়ো বাড়ির মধ্যে এনে ফেলল তাদের। চারিদিকে বড় বড় গাছ। তাতে আড়াল হওয়া একটা পড়ো-পড়ো বাড়ি। তবে দেউড়ির পর একখানা দালান গোছের জিনিস দাঁড়িয়ে আছে। শালা-ভগ্নীপোত গরু সমেত ঢুকে পড়ল সেখানে।

আর তখনই বাইরে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় আছড়ে পড়ল। কয়েকটা গাছ উপড়ে প্রায় উড়ে গিয়ে দূরে আছড়ে পড়ল। ঘরটাও থরথর করে কেঁপে উঠছিল বাতাসের ধাক্কায়। ভারি হতভম্ব হয়ে তারা দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

ঝড় যখন থামল তখন অন্ধকার হয়ে এসেছে। বাইরে বেরিয়ে কিন্তু তারা কোথায় এসেছে আর কোনদিকে গেলে গাঁয়ে পৌঁছোনো যাবে তা ঠাহর করতে পারল না। অন্ধকারে চারদিকটা একদম লেপাপোঁছা।

ওরে ঝিকু, এ তো বড় বিপদেই পড়া গেল।

তাই তো জামাইদা! এই অন্ধকারে কোনদিকে যাওয়া যায়?

হাতের দড়িতে মৃদু টান পড়তেই হাঁটতে হাঁটতে পানাই বলল, আয় ঝিকু, সাবিত্রীর পিছু পিছু যাই চল। ঝড়ের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। কি জানি বাপু, গরুটা বোধহয় সাক্ষাৎ ভগবতী।

আশ্চর্যের বিষয়, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গরু নিয়ে তারা গাঁয়ের চৌহদ্দিতে ঢুকে পড়তে পারল।

ঝিকু, সাবিত্রী কী করে আমাদের গাঁ চিনল বলতে পারিস?

না দাদা, আমার মাথা ঝিমঝিম করছে।

বাড়ি আসতেই শাঁখ আর উলুধ্বনি দিয়ে পানাইয়ের বউ গরুকে বরণ করে চাল কলা আরও কী সব মেখে খেতে দিল। বাচ্চারা এসে গরুর গায়ে হাত বুলোতে লাগল।

পানাই বলল, লক্ষী গরু চেয়েছিলে, কপালজোরে তাই মিলিয়ে দিয়েছেন ভগবান। মা লক্ষ্মীকে পেন্নাম করো সবাই।

সাবিত্রী ভারি খুশি হয়ে ডাক ছাড়ল, হাম্বা।

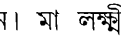

রাতের অতিথি

গোপালবাবু যে!

শুনলুম কাল রাতে আপনার বাড়িতে চোর এসেছিল!

ওঃ, সে কী কাণ্ড মশাই! চোর বলে চোর! সাংঘাতিক চোর!

চোর-ডাকাতেরই যুগ পড়েছে মশাই। চারদিকেই চুরির একেবারে মোচ্ছব পড়ে গেছে। কী চুরি হচ্ছে না বলুন। সোনাদানা, টাকাপয়সা, বাসনকোসন, জামাকাপড়, এমনকি জুতো, ঝাঁটা, বস্তা, পাপোষ যা পাচ্ছে চেঁছেপুঁছে নিয়ে যাচ্ছে। পরেশবাবুর বাড়িতে যেদিন চুরি হল তার পরদিন তো তাদের লজ্জা নিবারণের বস্ত্রটুকু পর্যন্ত ছিল না।

তা যা বলেছেন। চোরদের আস্পদ্দা দিন-দিন বাড়ছে।

অতি সত্য কথা। নরেনবাবুর বাড়িতে যে চোরটা এসেছিল সে তো রীতিমতো নরেনবাবুকে দু-চার কথা শুনিয়ে যেতে ছাড়েনি। কিপটে, কঞ্জুস, নীচু নজর, রুচিহীন, এমনকি এমন কথাও বলে গেছে, আপনার বাড়িতে চুরি করতে এসে যে ভুল করেছি, গঙ্গাস্নান করে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে...

বটে! এ তো সাঙঘাতিক অপমান।

অপমান বলে অপমান! নরেনবাবু তো সেই থেকে ভারী মনমরা হয়ে পড়েছেন। দু-দিন অন্নজল গ্রহণ করেননি। তবে কিনা বিশ্বকঞ্জুস নরেনবাবুর সেই থেকে হাত বেশ দরাজ হয়েছে। এখন দেখছি বাজার থেকে বড় মাছ, ময়রার দোকান থেকে

সন্দেশ এসব কিনছেন।

তাই নাকি! এই জন্যই সব জিনিসেরই খারাপ আর ভালো দুটো দিক থাকে।

তা আপনার বাড়ি থেকে কী-কী চুরি গেল?

সেসব এখনও হিসেব করা হয়নি।

কিন্তু গোপালবাবু, আপনার কবজিতে রোলেক্স হাতঘড়িটা এখনও দেখতে পাচ্ছি যে! ব্যাপারটা কী? চোর কি ওটা দামি ঘড়ি বলে বুঝতে পারেনি?

পারেনি মানে! ঘড়িটা একটানে খুলে নিয়ে একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে কত সালের কোন মডেল, কত দাম সব গড়গড় করে বলে গেল মশাই।

তাজ্জব কথা! তবু নেয়নি?

না। ঘড়িটা খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়ে বলল, এ ঘড়ির এখন অনেক দাম। সাবধানে রাখবেন।

বলেন কী? কলিযুগ কি শেষ হয়ে গেল নাকি মশাই? তারপর ধরুন, আপনার স্ত্রীর গলায় একটা পনেরো ভরির সীতাহারের কথাও যেন শুনেছি। সবাই বলে খুব দামি হার নাকি। তা সেটা নিশ্চয়ই গেছে।

উঁহু। সীতাহারটা তো ছুঁলই না। দূর থেকেই বলে দিল চৌদ্দ ভরি আট রতি মাপা আছে। এখনকার বাজার দর নাকি দেড় লাখ টাকার ওপরে।

সেটাও নেয়নি! এ আবার কেমনধারা চোর? আপনার লোহার আলমারিটা খোলেনি?

খুলেছে বইকি। চোর বলে কথা! খুলল, দেখল।

ওই আলমারিতেই তো বোধ হয়—

ঠিকই ধরেছেন। আমার সব ক্যাশ টাকা ওই আলমারিতেই থাকে। আজ লেবার পেমেন্টের জন্য আড়াই লাখ টাকা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে ওই আলমারিতেই রেখেছিলাম। টাকাগুলো বের করে গুনেটুনে দেখলও।

তারপর থলিতে ভরল তো!

হ্যাঁ, থলিও তার সঙ্গে একটা ছিল বটে। রুকস্যাকের মতো একটা ব্যাগ। ভরার উপক্রমও একবার করেছিল। তারপর নিজের মনে "না থাক" বলে যেমন ছিল তেমনি আবার আলমারিতে সাজিয়ে রেখে দিল।

আড়াই লাখ টাকা! চোর আড়াই লাখ টাকা হাতে পেয়েও নিল না মশাই! এঃ, আমারই তো হাত কামড়াতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আপনার সেই দুবাই না তেহেরান থেকে আনা হীরের কালেকশনটা? লোকে তো বলে পূর্ব ভারতে আপনার মতো হীরের কালেকশন কারও কাছে নেই।

ঠিকই বলে। আমি বহুকাল ধরেই হীরে কালেকশন করে আসছি, ওটাই আমার নেশা। রেয়ার সব হীরে মশাই। লাখ-লাখ টাকা দাম।

তা সেসব কি ছাড়তে পারে?

ছাড়েওনি। আমাকে দিয়ে জোর করিয়ে সিন্ধুক খুলিয়ে সব আঁতিপাঁতি করে দেখেছে। দেড়শো হীরে ছাড়াও নানান সাইজের মুক্তো, নীলা, পোখরাজ, চুনি, গোমেদ মিলিয়ে কয়েক কোটি টাকার পাথর।

আহা, শুনেই আমার পিলে চমকাচ্ছে। তা গেল তো

সেগুলো! যাবেই। অত দামি জিনিস কি বাড়িতে রাখতে আছে মশাই? ব্যাঙ্কের ভল্টে বা মাটির নীচে পুঁতেটুঁতে রাখতে হয়।

তা বটে। সেরকম একটা ফন্দি মনে-মনে ঠিকও করে রেখেছি। কিন্তু সেটা কার্যকর করার আগেই কাল মধ্যরাতে চোরের আবির্ভাব।

জানালা ভেঙে ঢুকল বুঝি?

না, অতি ঘোড়েল চোর। ভাঙচুর করলে তো শব্দ শুনতে পেতাম। আমার আবার ভারী সজাগ ঘুম। বাড়ির দেউড়িতে দারোয়ান আছে, দু-দুটো অ্যালসেশিয়ান কুকুর, টোটাভরতি বন্দুক আছে, বালিশের তলায় পিস্তল নিয়ে শুই। সুতরাং মোটামুটি নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিশ্ছিদ্রই বলা যায়।

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনার বাড়িটা তো দুর্গ বিশেষ। কুকুরদুটোও খুবই তেজী। দারোয়ান দুটোও বেশ তাগড়াই চেহারার বটে। তাহলে চোরটা ঢুকল কীভাবে বলুন তো!

সেটাই রহস্য। আমি চোরটাকে জিগ্যেসও করেছিলুম, বাপু হে, এ বাড়িতে ঢোকা তো সহজ নয়! তুমি ঢুকলে কি করে?

জবাবে কী বলল?

বলল, দুনিয়ায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বলে কিছু নেই। সব জায়গাতেই ঢোকা সম্ভব। আমি আপনার বাড়ির সামনের তেঁতুল গাছ থেকে হুক সমেত একটা নাইলন দড়ি ছুড়ে ছাদের রেলিঙে আটকে দিয়ে সেইটে বেয়ে ছাদে এসে নামি।

এ তো দেখেছি টারজান!

তা বলতে পারেন। দিব্যি কসরত করা চেহারা। ভদ্রঘরের ছেলের মতোই মনে হয়।

দিনকাল যা পড়েছে, ভদ্রঘরের বেকার ছেলেদেরও এইসব পথেই নামতে হচ্ছে। তা তারপর কী হল?

চোরেরা নিঃশব্দে চুরি করে, সেটাই রেওয়াজ। কিন্তু এর কায়দা আলাদা। খুব মোলায়েম গলায় আমার নাম ধরে ডেকে ঘুম ভাঙাল।

নাম ধরে? ছিঃ-ছিঃ, আপনি বয়স্ক মানুষ।

না, সে আমাকে গোপালকাকা বলে ডেকেছিল।

বাঁচোয়া। তারপর বলুন।

আমি পিস্তল খুঁজতে গিয়ে দেখি, সেটা যথাস্থানে নেই। চোরটা বলল, অস্ত্রশস্ত্র আমি সরিয়ে নিয়েছি। আলমারি সিন্দুক সব খুলুন। সময় নেই।

ওরে বাবা! এ তো চোরের বেশে ডাকাত!

তাও বলতে পারেন। সব দেখল। টাকাপয়সা, হীরেজহরত, সোনাদানা, কিন্তু কোনওটাই তার যেন তেমন পছন্দ হচ্ছিল না। হীরেজহরতগুলো একটু নাড়াচাড়া করল বটে, কিন্তু যেন তেমন গা করল না।

এ কেমন বেয়াদব চোর মশাই! এত কসরত করে ঢুকল, সব হাতের নাগালে পেল তাও তার গাল উঠল না কেন?

সেইটেই রহস্য। সব দেখেশুনে বলল, আপনার আর কোনও দামি জিনিস নেই? আমি অবাক হয়ে বললুম, এর চেয়ে দামি জিনিস আর কী থাকবে? চোরটা মুখ বেঁকিয়ে বলল, হ্যাঁ, এসব দামি জিনিস বটে, কিন্তু আমার দরকার লাগবে না।

বটে! খুব নবাবপুত্তুর দেখছি। তারপর?

তারপর সে বলল, আপনার বইপত্র কোথায় থাকে? আমি

বললুম, নীচের লাইব্রেরি ঘরে।

বইপত্র! ছোঃ! বইপত্র দিয়ে কী হবে?

সেইটে তো জানি না। তবে নিয়ে যেতে হল। দেখলাম বইপত্রে তার বেশ আগ্রহ আছে। বিস্তর বই বের করে-করে দেখল, আবার যত্ন করে জায়গায় রেখে দিল। অনেকক্ষণ ধরে প্রতিটি আলমারি ঘাঁটল সে।

বই ঘেঁটে সময় নষ্ট করা কেন বাপু?

আমিও তাকে সেকথাই বলেছিলুম। সে বলল, ও আপনি বুঝবেন না।

তারপর?

বললে বিশ্বাস করবেন না, খুঁজে পেতে সে একখানা বই বের করল। বেশ পুরোনো বই। নাম নীলবসনা সুন্দরী। কার লেখা জানি না। বইপত্র পড়ার অভ্যাস আমার নেই। বাপ-দাদার আমল থেকেই ওগুলো পড়ে আছে।

নীলবসনা সুন্দরী! তা সেটা কী করল?

সেটাই চুরি করল মশাই। বলল, এটা চুরি করতেই আমার আসা।

শুধু একটা বই?

হ্যাঁ। বইটা নিয়ে সে হাওয়া হয়ে গেল মশাই!

আশ্চর্য! এরকম আহাম্মক আর দেখিনি!

কবচ

আরে হরিপদবাবু যে! প্রাতঃপ্রণাম, প্রাতঃপ্রণাম!

প্রাতঃপ্রণাম। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলুম না মশাই?

তার তাড়াহুড়ো নেই, ক্রমে ক্রমে চিনবেন। আগে কুশলপ্রশ্নাদি সেরে নিই তারপর তো অন্য কথা। তা বলি আপনার খিদে-টিদে ঠিকমতো হচ্ছে তো? রাতে বেশ সুনিদ্রা হয় তো? কোষ্ঠ নিয়মিত পরিষ্কার হচ্ছে তো?

দেখছেন তো মশাই, বাজার যাচ্ছি। এখন কি আর এত খতেনের জবাব দেওয়ার সময় আছে?

কিন্তু হরিপদবাবু, প্রশ্নগুলোকে তুচ্ছ ভাববেন না। এসব প্রশ্নের পিছনে গূঢ় উদ্দেশ্যও থাকতে পারে তো। এই যে ধরুন, আপনার মুখ দেখে মনে হচ্ছে রাতে ভালো ঘুমোননি, নানারকম দুশ্চিন্তা করেছেন। আপনার তেমন খিদেও হচ্ছে না বলে মুখখানা আঁশটে করে রেখেছেন। কোষ্ঠ পরিষ্কার হচ্ছে না বলে আপনার মেজাজটাও বেশ তিরিক্ষি। ঠিক কি না!

তা খুব একটা ভুলও বলেননি বটে। আপনার মতলবখানা কী বলুন তো?

চলুন, বাজারের দিকে হাঁটতে-হাঁটতেই দুটো কথা কয়ে নিই।

কথা কওয়ার উদ্দেশ্যটা কী একটু বলবেন? খামোখা একজন উটকো লোকের সঙ্গে হাপরহাটি বকে মরার সময় আমার নেই।

আহা, চটে যাচ্ছেন কেন? ষষ্ঠীচরণ যে আপনার কাছে পাঁচ হাজার টাকা পায় আর সুদসমেত সেই পাঁচ হাজার যে পঞ্চাশ হাজার দাঁড়িয়ে যেতে বসেছে, আর পচা গুণ্ডা যে ষষ্ঠীচরণের হয়ে আপনার গলায় গামছা দিয়ে প্রতি মাসে অন্যায্য টাকা আদায় করছে, সে তো আর আমার অজানা নয়।

দাঁড়ান মশাই, দাঁড়ান। এসব গুহ্য কথা আপনি জানলেন কী করে? মেয়ের বিয়ের সময় মোটে পাঁচটি হাজার টাকা ষষ্ঠীচরণের কাছে ধার নিয়েছিলুম। তখন কি আর জানতুম যে ওই পাঁচ হাজারের ফেরে আমার ঘটিবাটি চাঁটি হওয়ার জোগাড় হবে! ঠিকই বলেছেন মশাই, আমার খিদে হচ্ছে না, ঘুম উধাও, কোষ্ঠ পরিষ্কার হওয়ার লক্ষণই নেই।

শুধু কি তাই হরিপদবাবু? গণকঠাকুর সদানন্দ সরখেল যে শনির দৃষ্টি কাটানোর জন্য প্রায় জবরদস্তি একখানা নীলা ধারণ করিয়েছিলেন তারও কিস্তি টানতে গিয়ে আপনি কি কম নাকাল হচ্ছেন। সদানন্দ আবার ভয় দেখিয়ে রেখেছে যে, কিস্তি ঠিকঠাক না দিলে মহাক্ষতির অভিশাপ লাগবে। তার ওপর ধরুন আপনার বাড়ির পাশেই মহাকালী ব্যায়ামাগারের আখড়া। তারা জোর করে আপনার জমির আড়াই ফুট বাই ষাট ফুট দখল করে বসে আছে, আর আপনি প্রতিবাদ করলেই তেড়ে আসছে, এও তো সবাই জানে কিনা।

আশ্চর্য মশাই, আমি আপনাকে না চিনলেও আপনি তো দেখছি আমার সব খবরই রাখেন! তা মশাই, এত সব জানলেন কী করে? আপনি কি শত্রুপক্ষের লোক?

ছিঃ-ছিঃ, হরিপদবাবু এরকম অন্যায় সন্দেহ আপনার হল কী করে? আপনার ভালো চাই বলেই না আর পাঁচটা গুরুতর কাজ

ফেলে আপনার সাহায্যের জন্য ছুটে এসেছি! আপনার গিন্নির বাঁ-হাঁটুর বাত আর অম্বলের অসুখের জন্য ডাক্তার বদ্যি আর ওষুধের পিছনে আপনার যে হাজার-হাজার টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে সে খবর জানি বলেই না আপনার দুঃখে দুঃখিত হয়ে না এসে থাকতে পারলাম না।

কিছু মনে করবেন না মশাই, আজকাল লোক চেনা খুব শক্ত বলে একটু ধন্দ ছিল। এখন বুঝতে পারছি, আপনি তেমন খারাপ লোক নন।

নই-ই তো! এই যে গেল হপ্তায় আপনি অফিসের লেজারে একটা চল্লিশ হাজার টাকার ক্রেডিট এন্ট্রি ভুল করে ডেবিটের ঘরে বসিয়ে দিয়েছিলেন, তার জন্য গণেশবাবু কী অপমানটাই না আপনাকে করলেন। ইডিয়ট, গুড ফর নাথিং, অপদার্থ, মিসফিট, নন-কমিটেড ইত্যাদি কী বলতে বাকি রাখলেন বলুন! তার ওপর হেড অফিসে জানিয়ে আপনাকে পায়রাডাঙায় বদলি করার হুমকিও দিয়ে রেখেছেন। আর আপনি ভালোই জানেন, পায়রাডাঙায় বদলি হওয়া মানে আপনার ভবিষ্যৎ অন্ধকার।

ওঃ মশাই, আপনি নির্ঘাত অন্তর্যামী। এত খবর রাখেন দেখে আমি কেবল অবাকের পর অবাক হচ্ছি। সত্যিই মশাই, গণেশবাবুর মতো এমন অকৃতজ্ঞ লোক হয় না। এই তো গত ইয়ার এন্ডিং-এ গণেশবাবুর মান বাঁচাতে পরপর চারদিন অফিসের সময় পার করেও দু-তিন ঘণ্টা করে বেশি খেটে তাঁর কাজ তুলে দিয়েছি। এই কি তার প্রতিদান? আর ভুলটাও এমন কিছু মারাত্মক নয়। সেদিন জামাইষষ্ঠীর নেমন্তন্নে যাব বলে একটু তাড়াহুড়ো ছিল। বিকেল ছ'টা ছাব্বিশের ট্রেন ধরব বলে তাড়াতাড়ি কাজ সারতে গিয়ে সামান্য একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল।

সেই কথাই তো বলছি। তারপর ধরুন, এপ্রিলের তেইশ তারিখে সন্ধে সাতটা দশ মিনিটে রথতলার মোড়ে কী কাণ্ডটা হল?

কিছু হয়েছিল নাকি? কী হয়েছিল বলুন তো?

সে কী মশাই, এত বড় ঘটনাটা ভুলে মেরে দিলেন! আপনার তো এখনও ভীমরতি ধরার বয়স হয়নি। মাত্র বিয়াল্লিশ বছর তিন মাস, এর মধ্যেই স্মৃতিবিভ্রম তো ভালো কথা নয়। অবশ্য জলাতঙ্কের ইনজেকশান নিলে অনেক সময়ে শরীরে নানারকম কেমিক্যাল চেঞ্জ হয়, তাতে স্মৃতিবিভ্রম হওয়াও বিচিত্র নয়।

আমি যে জলাতঙ্কের ইনজেকশান নিয়েছিলাম এ খবরও আপনি জানেন দেখছি! নাঃ, আমার আরও অবাক হওয়ার উপায় নেই মশাই। ইতিমধ্যে অবাক হওয়ার অপটিমামে পৌঁছে গেছি।

আহা, অবাক হওয়ার দরকারটাই বা কী আপনার! এপ্রিলের তেইশ তারিখে সন্ধে সাতটা দশ মিনিটে রথতলার মোড় দিয়ে আসার সময় আপনি যে দূরে শ্যামাদাস মিত্তিরকে দেখে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে 'শ্যামাদাস, ওহে শ্যামাদাস' বলে চিৎকার করে ছুটে গিয়েছিলেন, তা কি আপনার মনে নেই?

দোষটা কিন্তু শ্যামাদাসেরই, বুঝলেন মশাই, গত অক্টোবরে পাহাড়ে বেড়াতে যাবে বলে আমার কাছে দূরবিনটা ধার চেয়েছিল। দূরবিনটা আমার ঠাকুরদার। সাবেক জিনিস, একটা স্মৃতিচিহ্নও বটে। কিন্তু শ্যামাদাস এমন বেআক্কেলে যে, দূরবিনটা ছ'মাসের মধ্যে ফেরত দিল না। চাইলেই বলে, দেব দিচ্ছি। তারপর শুনলুম তার বড় শালা নাকি দূরবিনটা তার কাছে চেয়ে নিয়ে গেছে দক্ষিণ ভারতে বেড়াতে যাবে বলে। বলুন তো,

টেনশন হওয়ার কথা নয়! তাই সেদিন তাকে দেখে ওরকম ব্যস্ত হয়ে ছুটে গিয়েছিলুম।

আর তার ফলেই না আপনি রাস্তার একটা নেড়ি কুকুরের লেজ মাড়িয়ে ফেললেন। আর কুকুরটাও ঘ্যাক করে আপনার ডান পায়ে কামড় বসিয়ে দিল।

ওঃ, সে একটা দুঃস্বপ্নের মতো ঘটনাই বটে। তবে আপনি যে অন্তর্যামী সে বিষয়ে আমার আর কোনও সন্দেহই নেই। এসব ঘটনা আমার বাড়ির লোক আর অফিসের কলিগরা ছাড়া কেউ জানে না। কুকুরের কামড়ের চেয়েও অনেক বেশি যন্ত্রণা হল পেটে অতগুলো ইনজেকশন নেওয়া। সে কী অসহ্য অবস্থা তা কহতব্য নয়।

না হরিপদবাবু, আপনি নবুবাবুর কথা ভুলে যাচ্ছেন। আপনার দুর্ভোগের জন্য নবুবাবুর অবদানের কথাটাও একটু ভাবুন। সেবার অ্যানুয়াল পরীক্ষায় নবুবাবুর ছেলে গজা অঙ্কে বাইশ পেয়েছিল। নবুবাবু তখন আপনাকে গজার প্রাইভেট টিউটর রাখেন। অঙ্কের মাস্টার হিসেবে আপনার খুবই সুনাম। গজাকে অঙ্ক শেখানোর জন্য আপনাকে নবুবাবু মাসে সাতশো টাকা দিতেন। তা দেবেন নাই বা কেন। নবুবাবুর টাকার লেখাজোখা নেই, আর গজাও তার একমাত্র ছেলে। কিন্তু হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় অঙ্কে এগারো পেল এবং অ্যানুয়েলে পেয়েছিল মাত্র তিন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে নবুবাবু আপনাকে ছাড়িয়ে তো দিলেনই, তার ওপর প্রতিহিংসায় উন্মত্ত হয়ে আপনার বিরুদ্ধে মামলা করলেন। অভিযোগ ছিল, আপনি ইচ্ছে করেই গজাকে ভুলভাল শিখিয়েছেন। তা ছাড়া তাঁর গোয়ালে আগুন লাগানোর অভিযোগে

এক দফা, তাঁর বুড়ি পিসির মৃত্যু হওয়ায় সেটাকে খুনের মামলা সাজিয়ে আর-এক দফা, তাঁর বাড়িতে যে ডাকাতির চেষ্টা হয়েছিল সেই বাবদে তিনি আর-এক দফা আপনাকে অভিযুক্ত করে এফআইআর করেন। পুলিশ একবার আপনাকে নিয়ে গিয়ে থানার লক আপে এক রাত্রি আটকেও রাখে। ঠিক কি না?

আর বলবেন না মশাই, আমার দোষ কী বলুন! গজা বেশিরভাগ দিনই অঙ্ক কষতে বসে ঘুমিয়ে পড়ত বা পেট ব্যথা বলে আমাকে বিদায় করে দিত। নবুবাবুকে বলেও লাভ হত না। বলতেন, ছেলেমানুষ, ওরকম তো একটু করবেই। ওই ফাঁকে-ফাঁকে শিখিয়ে দেবেন। কী কুক্ষণে যে গজাকে পড়াতে রাজি হয়েছিলুম কে জানে। নবুবাবু আমার জীবনটাই অসহ্য করে তুলেছেন।

সম্প্রতি তিনি আপনার বিরুদ্ধে একটা জালিয়াতির মামলা করার জন্যও তৈরি হচ্ছেন বলে শুনেছি।

ওরে বাবা!

তাই তো বলছি, আপনি কেমন আছেন সেটা জানা বড় দরকার।

যে আজ্ঞে। ভেবেচিন্তে মনে হচ্ছে আমি বিশেষ ভালো নেই। আমার ঘুম হচ্ছে না, খিদে হচ্ছে না, কোষ্ঠ পরিষ্কার হচ্ছে না। বুক দুরদুর করে, শরীর দুর্বল লাগে, মাথা ঘোরে।

আহা, তার জন্য চিন্তা কী হরিপদবাবু। আমি তো আছি।

আপনি আছেন, কিন্তু কীভাবে আছেন?

আপনার দুঃখ দুর্দশা দেখে আমার প্রাণ কেঁদে উঠেছিল বলেই তো হিমালয়ে পাহাড়িবাবার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম।

বলেন কী? আমার জন্যে আপনি হিমালয় ধাওয়া করেছিলেন? আপনি তো অতি মহৎ মানুষ মশাই। কিন্তু আমি তো আপনাকে চিনিও না!

তাতে কি? আমার চেনা-অচেনা ভেদ নেই। আপনার দুঃখের কথা পাহাড়িবাবার শ্রীচরণে নিবেদন করতেই উনি টানা পাঁচ বছরের ধ্যানসমাধি থেকে জেগে উঠে খুব চিন্তিত মুখে বললেন, তাই তো? হরিপদর সময়টা তো বিশেষ ভালো যাচ্ছে না! এর একটা বিহিত তো করতেই হয়।

বলেন কি মশাই?

তবে আর বলছি কী! পাহাড়িবাবার মহিমা তো জানেন না। সাক্ষাৎ শিবস্বয়ম্ভো! তিনি প্রসন্ন হলে আর চিন্তা কীসের? তা তিনি সব শুনেটুনে আপনার ওপর প্রসন্ন হয়েই এই একস্ট্রা স্পেশাল বগলামুখী কবচখানা পাঠিয়ে দিয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে কাঁচা দুধ, দই আর গঙ্গাজলে শোধন করে ধারণ করবেন। দেখবেন সব গ্রহ-বৈকল্য কেটে গিয়ে আপনি একেবারে অন্য মানুষ।

আপনি তো বড় পরোপকারী মানুষ মশাই।

আর লজ্জা দেবেন না। মানুষের জন্য আর কতটুকুই বা করতে পারি। যাই হোক, প্রণামী বাবদ সামান্য পাঁচ হাজার টাকা ফেলে দিলেই হবে।

অ্যাঁ!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ওয়ারিশান

ঘরের বাইরে পা রাখতেই প্রফুল্লবাবু দেখতে পেলেন, চারদিকে বেশ একটা হাসিখুশি ভাব। টমেটোর মতো টুকটুকে রাঙা রোদ উঠেছে, আমলকি গাছে বসে একটা দোয়েল পাখি ফচকে ছেলেদের মতো শিস দিচ্ছে, ঘাসের ওপরে হোমিওপ্যাথি ওষুধের ফোঁটার মতো শিশির জমে আছে, হিমেল একটা হাওয়া সজনে আর নিমগাছের সঙ্গে নানা কথা কইতে কইতে বয়ে যাচ্ছে। আরও যে সব দৃশ্য প্রফুল্লবাবুর চোখে পড়ল তাতে তাঁর খুশি হওয়ার কথা নয়। যেমন নগেন ঘোষাল দাঁত খিঁচিয়ে ঘ্যাঁস ঘ্যাঁস করে দাঁতন করছেন, পরাণ মিত্তির তাঁর বাড়ির বারান্দায় মাদুরে বসে উচ্চকণ্ঠে ছেলে পটলকে ইংরেজি গ্রামার পড়াচ্ছেন, নিমাই সরখেলের বুড়ি পিসি কতক বককে বকা-ঝকা করতে করতে সামনের উঠোনে গোবরছড়া দিচ্ছেন। এব নিত্যনৈমিত্তিক দৃশ্য। তবু আজ এসব দৃশ্য তাঁর ভারি ভালো লাগল। বাস্তবিক প্রফুল্লবাবু আজ খুবই প্রফুল্ল বোধ করছেন।

প্রফুল্লবাবুর প্রফুল্ল হওয়ার যথেষ্ট কারণও আছে। তাঁর অবস্থা বিশেষ সুবিধের নয়। বাজারে বেশ কিছু ধারদেনা আছে। চাষবাস থেকে তেমন আয় হয় না। টাকার অভাবে বাড়িটা মেরামত করতে পারছেন না, বর্ষাকালে ঘরে জল পড়ে। পয়সার জোর না থাকলে মানুষের কাছে মানসম্মানও বজায় রাখা যায় না। লোকে ভারী তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে। তিনি গরিব হলেও তাঁর

খুড়োমশাই বেজায় বড়লোক। লোহার কারবার করে লাখো লাখো টাকা করেছেন। তবে পঞ্চানন বিশ্বাস প্রফুল্লবাবুর মুখদর্শনও করতেন না। তার কারণ প্রফুল্লবাবুর যৌবন-কালে খুব যাত্রা-থিয়েটার করার নেশা ছিল, আর সেটা তাঁর বাবা বা কাকা কেউই পছন্দ করতেন না। প্রফুল্লবাবু লুকিয়ে গিয়ে যাত্রাদলে নাম লেখান এবং মেয়েদের ভূমিকায় চুটিয়ে অভিনয় করতে থাকেন। যাত্রা করছেন বলে যতটা নয় তার চেয়ে বেশি ওই পুরুষ হয়ে মেয়ে সেজে অভিনয় করতেন বলে বাবা আর কাকা দুজনেই তাঁর ওপর বেজায় খাপ্পা হয়ে ওঠেন। বাবা মারা যাওয়ার আগে তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র অবধি করে ছেড়েছিলেন, আর পঞ্চানন বিশ্বাস তাঁর সঙ্গে সব সম্পর্ক রহিত করে দেন। প্রফুল্লবাবু অবশ্য যাত্রাদলে বেশিদিন টিকতে পারেননি। কারণ ক্রমে ক্রমে মহিলার ভূমিকায় মেয়েরাই অভিনয় শুরু করতে থাকায় প্রফুল্লবাবুর কদর কমে যায়। তিনি যাত্রা ছেড়ে সংসারে মন দেন। কিন্তু তেমন সুবিধে করে উঠতে পারেননি। সম্প্রতি খবর এসেছে তাঁর নিঃসন্তান খুড়োমশাই তাঁর নামে আশি লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। খবরটা পেয়ে আশি লক্ষ টাকা মানে ঠিক কত টাকা তা তলিয়ে ভাবতে গিয়ে প্রফুল্লবাবু মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন। বিশ-পঞ্চাশ বা দুশো-পাঁচশো টাকা অবধি ভাবতে প্রফুল্লবাবুর বিশেষ অসুবিধে নেই। ক্ষেত্রবিশেষে দু-চার-পাঁচ হাজার অবধিও ভেবে ফেলতে পারেন। কিন্তু তা বলে আশি লাখ! ওরে বাবা! আশি লাখ তো পাহাড়-পর্বত। প্রথম মাথা ঘুরে পড়লেন, তারপর খেতে বসে কয়েকবার বেজায় বিষম খেলেন, আর প্রায়ই আনমনে চলাফেরা করতে গিয়ে ঘরের চৌকাঠে, রাস্তায় পড়ে

থাকা ইটে, ইঁদুরের গর্তে হোঁচট খেয়ে পা মচকালেন, তেলকে জল, জলকে তেল বলে ভুল করলেন।

তবে যাই হোক, তিন দিন ধরে তাঁর মনটা ভারি প্রফুল্ল রয়েছে। যখন-তখন ফিক ফিক করে হেসে ফেলছেন, আপনমনে বিড়বিড় করে মাথা নাড়া দিচ্ছেন, আনন্দটা একটু বেশি ঠেলে উঠলে ছাদে গিয়ে কয়েক পাক চড়কি নাচও নেচে নিচ্ছেন।

আজ রোববার পঞ্চানন বিশ্বাসের ম্যানেজার অঘোরবাবু আশি লাখ টাকার চেক নিয়ে আসছেন। শর্ত একটাই, গাঁয়ের পাঁচজন বিশিষ্ট লোক যদি প্রফুল্ল বিশ্বাসকে সনাক্ত করেন তবেই চেকটা হস্তান্তর করে অঘোরবাবু রসিদ নিয়ে চলে যাবেন। অঘোরবাবুর চিঠিতে এই সনাক্তকরণ ব্যাপারটার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। কারণ অঘোরবাবু প্রফুল্লবাবুকে চেনেন না, আর খুড়োমশাইও প্রফুল্লবাবুর মুখদর্শন করবেন না। তবে সেটা কোনও সমস্যাই নয়। এই গাঁয়ে তাঁর দীর্ঘকাল বাস। সবাই এক ডাকে তাঁকে চেনে। অঘোরবাবুর চিঠি পাওয়ার পরই প্রফুল্লবাবু গাঁয়ের পাঁচজন বাছা বাছা মাতব্বরকে গিয়ে ঠিক করে ফেলেছে। নগেন ভট্চায, বীরেশ মিত্তির, বৈকুণ্ঠ গোসাঁই, সদানন্দ সমাদ্দার আর পাঁচুগোপাল দত্ত। এঁরা সবাই মান্যগণ্য লোক। নগেন ভট্চায দারোগা ছিলেন, বীরেশ মিত্তির ছিলেন ওভারসিয়ার, বৈকুণ্ঠ গোসাঁইয়ের তেলকল আছে, সদানন্দ সমাদ্দার পঞ্চায়েতের পাণ্ডা, পাঁচুগোপাল দত্ত একজন নামকরা নাট্যকার, মেলা পালা লিখেছেন।

কিন্তু প্রফুল্লবাবুর এখন চিন্তা হল আশি লক্ষ টাকা নিয়ে। আশি লাখ অনেক টাকা বটে, কিন্তু একটু খুঁতও আছে। টাকাটা

মাছ
মাংস
চাল
দুধ

লাখই বটে, কোটি নয়। লোকে তাঁকে লাখোপতি বলবে ঠিকই, কিন্তু কোটিপতি বলবে না। কিন্তু কোটিপতিটা শুনতে আরও একটু ভালো। তাই প্রফুল্লবাবু প্ল্যান এঁটে রেখেছেন, টাকাটা হাতে পেয়ে খরচাপাতি একদম করবেন না। বরং আরও শক্ত হাতে খরচ কমিয়ে আশি লাখকে এক কোটিতে নিয়ে তুলবেন। বাজার থেকে মাছ-মাংস আনা ইতিমধ্যে বন্ধ করেছেন, তেরো টাকার চাল আনতেন, এখন আট টাকার মোটা চাল ছাড়া আনেন না, দুধের বরাদ্দ কমিয়ে অর্ধেক করে ফেলেছেন, কাজের লোক ছাড়িয়ে দিয়েছেন এবং আরও খরচ কী করে কমানো যায় তা নিয়ে দিন-রাত্তির মাথা ঘামাচ্ছেন। এ নিয়ে বাড়িতে ঝগড়াঝাঁটি এবং অশান্তি বড় কম হচ্ছে না। তাঁর গিন্নি তো তাঁকে পাগলের ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাবেন বলে নিত্য টানাহ্যাঁচড়া করছেন। বলছেন, কোথায় এক কাঁড়ি টাকা পেয়ে একটু ভালো-মন্দ বাজার করবে, গয়না-গাঁটি গড়িয়ে দেবে, বাড়িটা বেশ সারিয়ে-টারিয়ে ঝাঁ-চকচকে করবে, তা নয়, এ আরও পেচেশপনা শুরু হল।

যে যাই বলুক প্রফুল্লবাবু তাতে কান দিচ্ছেন না। টাকা জিনিসটাই ভারি অস্থায়ী, আজ আছে তো কাল নেই। যে ইস্কুলের নীচু ক্লাসে অঙ্ক কষেছিলেন, একটা আশি গ্যালনের চৌবাচ্চায় মিনিটে সাড়ে সাত গ্যালন জল ঢোকে এবং আট গ্যালন জল বেরিয়ে যায়, চৌবাচ্চাটি খালি হতে কত মিনিট লাগবে? অঙ্কটার কথা ভেবে আজ একটু শিউরে উঠলেন প্রফুল্লবাবু। সুতরাং বেরিয়ে যাওয়ার ফুটোটা আরও ছোটো করতে হবে এবং ঢোকার ফুটোটা বড় করা দরকার।

আজকাল ব্যয়সংকোচের নানা ফন্দিফিকির তাঁর মাথায়

ঘুরছে। আগে তাঁর বাড়িতে নিয়মিত কয়েকজন ভিখিরি আসত। এক মুঠো চাল বা সিকিটা-আধুলিটা দেওয়াও হত তাদের। আশি লাখ টাকার খবর পাওয়ার পর প্রফুল্লবাবু তাদের হুড়ো দিয়ে তাড়িয়ে ছেড়েছেন। তারা আর এ বাড়িমুখো হয় না।

অর্থাগম বাড়ানোর জন্য প্রফুল্লবাবু বন্ধকি কারবার খুলবেন বলে ঠিক করে ফেলেছেন। লোকের হঠাৎ বিপদে পড়ে টাকার দরকার হলে সোনাদানা বন্ধক রেখে চড়া সুদে ধার নেবে। এ কারবারে লোকসানের ভয় নেই, ষোলো আনা লাভ। টাকা সময়মতো শোধ করতে না পারলে তাদের সোনাদানাও প্রফুল্লবাবুর হাতে এসে যাবে। এই প্রস্তাবে অবশ্য তাঁর গিন্নির সায় নেই। উনি ভারি বিচলিত হয়ে বলেছেন, না, না, ও ভারি সব্বোনেশে ব্যবসা। লোকের বিপদ-আপদের সুযোগ নিয়ে টাকা রোজগার করা ভারি খারাপ, তাতে অমঙ্গল হবে। কিন্তু প্রফুল্লবাবু কানে তোলেননি। কোটি টাকা পার না হওয়া পর্যন্ত তার সোয়াস্তি নেই।

নগেন ভট্চাযের বেশ দশাসই লম্বাই চওড়াই চেহারা, কাঁচাপাকা পেল্লায় গোঁফ আর বাবরি চুল।

বীরেশ মিত্তির রোগা-ভোগা মানুষ, তাঁরও গোঁফ আছে বটে, কিন্তু ঘোলা গোঁফ। তেলকলের মালিক বৈকুণ্ঠ গোসাঁইয়ের চেহারাখানাও বেশ তেল চুকচুকে, নাদুস-নুদুস, দাড়ি-গোঁফের বালাই নেই, মাথাজোড়া টাক। সদানন্দ সমাদ্দারের কেঠো রসকষহীন নিরানন্দ চেহারা, সর্বদাই ভারি ব্যস্তসমস্ত ভাব। পাঁচুগোপাল দত্ত ভারি ঠান্ডা সুস্থির মানুষ, মুখে সর্বদা পান আর মিঠে হাসি। বেলা দশটার মধ্যেই একে একে এসে পড়লেন সব।

নগেন ভট্চায বাজখাঁই গলায় বললেন, কই হে প্রফুল্ল। আপ্যায়নের কী ব্যবস্থা হয়েছে শুনি! আমার আবার সকালে দুটি হাফ বয়েল ডিম না হলেই চলে না।

প্রফুল্লবাবুর মুখ শুকিয়ে গেল। আপ্যায়নের ব্যবস্থা যে তিনি করেননি তা নয়, তবে একটু চেপে-চুপে। দুটি করে সন্দেশ আর একটি করে সিঙাড়া। আমতা আমতা করে বললেন, তা সে ব্যবস্থাও হবে।

বীরেশ মিত্তির মাথাটা ঘন ঘন নাড়া দিয়ে বললেন, হ্যাঁ! হাফ বয়েল ডিম আবার একটা বস্তু হল! ডিম ভাঙলেই ফচ করে খানিকটা সিকনির মতো বেরিয়ে আসে। ছ্যাঃ! ছ্যাঃ! বলি সকালবেলায় লুচি দিয়ে মোহনভোগ খেয়েছো কখনও?

সদানন্দ সমাদ্দার অত্যন্ত অসন্তুষ্ট গলায় বললেন, ওহে এই বয়সে ওসব গুরুভোজন কোনও কাজের কথা নয়। ডিমে কোলেস্টরেল বৃদ্ধি, লুচি আর মোহনভোগে হাই ক্যালোরি, বরং দুধ কলা দিয়ে পোটাক ছাতু মেরে দাও, সারাদিনের মতো পেট ঠান্ডা।

পাঁচুগোপালবাবু মুখে পান, খাবার-দাবারের কথায় বিশেষ উৎসাহ বোধ করলেন না। খুব ঠান্ডা মিষ্টি গলাতেই বললেন, তা কীরকম খরচাপাতি করবে হে প্রফুল্ল?

প্রফুল্লবাবু আমতা আমতা করে বললেন, কীসের খরচাপাতির কথা বলছেন বলুত তো পাঁচুদা।

বীরেশবাবু বললেন, আহা, গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপটার কথাই তো বলা হচ্ছে হে। পড়ো-পড়ো অবস্থা, সংস্কার না করলেই নয়, টাকার জোগাড় ছিল না বলেই হয়নি। তোমার টাকা পাওয়ার

খবর পেয়েই আমরা এস্টিমেট নিয়েছি, তা ধরো কমসম করেও সাড়ে তিন লাখে দাঁড়াচ্ছে!

নগেন ভট্চায মশাই উদার গলায় বললেন, আহা, সেই সঙ্গে রাসেশ্বরীর মন্দিরের এস্টিমেটটাও জুড়ে দাও না হে। চূড়াটা কবে ভেঙে পড়ে গেছে, পশ্চিমের দেয়ালে ফাটল, পুকুরঘাটের সিঁড়ি ভেঙে ধসে গেছে। তা ওই লাখ চারেক হলেই হয়ে যাবে মনে হয়। এক-আধ লাখ এদিক-ওদিক হতে পারে।

সদানন্দ মিষ্টি করে হেসে বললেন আরে, প্রফুল্লর টাকা তো গাঁয়েরই টাকা, কী বলো? গরিব গাঁ আর কার ভরসা করবে! ফটক বাজার থেকে কালীতলা অবধি রাস্তাটার হাল দেখেছ? বর্ষাকালে অগম্য। দশ থেকে বারো লাখ ফেলে দিলেই রাস্তা একেবারে রেড রোড হয়ে যায়। নিরঞ্জন ঠিকাদার তো মুখিয়ে বসে আছে হে।

নগেনবাবু বললেন, আহা, ও আর চিন্তার কি আছে! আশি লাখ টাকার মালিকের কাছে ও তো নস্যি!

বীরেশ মিত্তির পকেট থেকে একখানা কাগজ বের করে কী দেখছিলেন, মুখ তুলে বললেন, ও আরও একটা ব্যাপার মনে পড়ে গেল হে। প্রগতি সংঘের ক্লাবঘর আর নবীন যুবদলের খেলার মাঠ। বেচারারা বহুকাল হাপিত্যেশ করে আছে। ক্লাব-ঘরের জন্য লাখ তিনেক আর খেলার মাঠ বাবদ মাত্র দেড় লাখ।

পাঁচুগোপাল পানের পিক ফেলে এসে বললেন, আসল কথাটাই তো এখনও তুললে না তোমরা! বিদ্যাপতি ইনস্টিটিউশনের এক্সটেনশন বিল্ডিং আর বয়েজ হোস্টেল। ও দুটো না হলেই

নয়। গাঁয়ের মান থাকছে না। দুটো মিলিয়ে বাইশ-তেইশ লাখে দাঁড়াবে গিয়ে।

বীরেশবাবু কি যেন যোগ করতে চাইছিলেন, ঠিক এমন সময়ে সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল। প্রফুল্লবাবু গিয়ে দরজা খুলে বললেন, কাকে চাই?

আজ্ঞে আমি অঘোর সরকার, পঞ্চানন বিশ্বাসের ম্যানেজার। এটা কি প্রফুল্ল বিশ্বাসের বাড়ি?

প্রফুল্লবাবু অম্লান বদনে বললেন, না। প্রফুল্লবাবু মারা গেছেন।

যতীনবাবুর চার হাত

যতীনবাবুর দোষটা কি জানেন?

আজ্ঞে না, দোষাটা কী বলুন তো!

যতীনবাবুর সবচেয়ে বড় দোষ হল উনি বড্ড ভালোমানুষ।

অ। তা ভালোমানুষিটা দোষের খাতে ধরছেন কেন?

ধরব না মশাই? কিছু পৈতৃক সম্পত্তি ছিল, ব্যাংকে দিব্যি মোটা টাকার আমানত ছিল, কয়েক লাখ টাকা শেয়ারেও খাটছিল। গাড়ি-বাড়ি-জমিজমায় একপ্রকার ভাসাভাসি কাণ্ড, কিন্তু ওই যে, ভালোমানুষির দোষ। কেবল বলেন আমি একা ভালো থাকলে তো হবে না, অন্যদেরও ভালো রাখতে হবে। আর যেমনি কথা তেমনি কাজ। দু-হাতে আর কতই বা বিলানো যায়। ভগবান যদি চারখানা হাত দিতেন তবে বিলিয়ে সুখ হত।

বটে। তা তার ঠিকানাটা কী বলুন তো!

আহা! আগে সবটা শুনুন, তবে তো!

কিন্তু দেরি করলে সব বিলি হয়ে যাবে যে!

আরে না মশাই, না। বিলি হয়েই যেত, কিন্তু ভগবান যে তাঁর আবদার মঞ্জুর করবেন সেটা যতীনবাবু ভেবে দ্যাখেননি। এখন যে তাঁর বড় বিপদ চলছে।

কেন মশাই, বিপদ কীসের?

বলছি মশাই, বলছি। তার আগে একটা কথা শুনে রাখুন। ভগবান মানুষটা কিন্তু বড্ড বেখেয়ালের লোক। বড় গলা করে

চেয়েচিন্তে দেখবেন, কথাটা ভগবান কানেই তুলবেন না হয়তো। কিন্তু হঠাৎ হয়তো আনমনে ফিসফিস করে কিছু একটা চেয়ে বসলেন, অমনি সেটা মঞ্জুর করে দিলেন। তাতে যে কত বিভ্রান্তি হয় সেটা মোটেই ভেবে দেখলেন না।

তা হলটা কী মশাই?

ওই চারটে হাত চেয়েছিলেন যতীনবাবু, ওইটেই তাঁর কাল হল। রাত্রিবেলা শুয়ে ঘুমোচ্ছেন হঠাৎ বগলের তলায় সুড়সুড়ি। প্রথমটায় তেমন বুঝতে পারেননি। অস্বস্তি বোধ করে এপাশ-ওপাশ করছেন, হঠাৎ দুই বগল ফুঁড়ে ভচাক ভচাক করে আরও দুটো হাত বেরিয়ে এল। প্রথমটায় তো চোরের হাত মনে করে চেঁচামিচে জুড়ে দিলেন। বাড়ির লোকজনও সব লাঠিসোঁটা নিয়ে দৌড়ে এল। কিন্তু কাণ্ড দেখে সবাই তাজ্জব। চোর-ডাকাতের ব্যাপার নয়। যতীনবাবুর দুই বগলের তলা দিয়ে গায়ের গেঞ্জি ছিঁড়ে-খুঁড়ে আরও দুটো হাত বেরিয়ে এসেছে।

যাঃ, এ আপনি গুল দিচ্ছেন।

আপনি তো গুল বলেই খালাস। যতীনবাবু অবস্থা দেখলে বুঝতে পারতেন এটা গুল হলেই বরং ভালো ছিল।

কেন মশাই, দু-দুটো বাড়তি হাত থাকলে কাজকর্মের বেশ সুবিধেই হওয়ার কথা।

কাজকর্মের কথা আর বলবেন না মশাই। কাজকর্মের আগে আরও জ্বলন্ত সব সমস্যা রয়েছে। প্রথম কথা যতীনবাবু সব জামারই দুটো করে হাতা। কিন্তু চারটে হাতকে দুটো হাতায় গলানো যাচ্ছে না বলে সকালেই দর্জিদের ডেকে পাঠানো হল। তারাও পড়ল সমস্যায়। জীবনে চার হাতাওয়ালা জামা বানায়নি,

প্রথম সমস্যা হল সেটা।

আহা, হাতাগুলো একটু বেশি ঢোলা করে দিলেই তো হয়।

না, হয় না। নতুন হাত দুটো মহা বজ্জাত। তারা পুরোনো হাতের সঙ্গে এক হাতায় ঢুকতেই রাজি নয়। তারা মুঠো পাকিয়ে দর্জিদের দিকে তেড়ে যাওয়ায় সেই চেষ্টা থেকে বিরত থাকা হয়েছে। যাই হোক, শেষ অবধি চার হাতওয়ালা জামা তৈরি করা হল বটে, কিন্তু চার হাতার গেঞ্জি অমিল। যতীনবাবুর আবার গেঞ্জি ছাড়া চলে না, শেষ অবধি হোসিয়ারিতে অর্ডার দিয়ে অনেক কষ্টে গেঞ্জিরও বন্দোবস্ত হল। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল অন্য ক্ষেত্রে।

সেটা কীরকম?

বলছি। যতীনবাবু এখন একুনে দুখানা ডান হাত আর দুখানা বাঁ-হাত, বুঝলেন তো!

দিব্যি বুঝেছি। দুটো ডান, দুটো বাঁ, সোজা হিসেব।

হিসেবটা যদি এত সোজা হত তাহলে আর চিন্তা ছিল কী? প্রথম মুশকিল হল খেতে বসে। যতীনবাবু পুরোনো ডান হাত দিলে জলখাবারের একখানা লুচি আলুর ছেঁচকি সাপ্টে সবে মুখে তুলেছেন অমনি তাঁর নতুন ডান হাত ফস করে আরও দুখানা লুচি পায়েস মেখে তাঁর মুখে দিল গুঁজে। এখন আপনি বলুন আলুর ছেচকি সঙ্গে পায়েস মিশে গেলে সেটা খেতে কেমন হয়।

তাই তো! কথাটা ভেবে দেখার মতো।

দুপুরে সবে ঘি মাখা ভাতের গরাস মুখে তুলতে যাবেন এমন সময় তার বিকল্প ডান হাত একগোছা সজনে ডাঁটার চচ্চড়ি তার

মুখে গুঁজে দিলে যতীনবাবুর মনের অবস্থাটা কী হয় বলতে পারেন।

খুব খারাপ হওয়ার কথা।

আর শুধু কি তাই? টেলিফোন ধরতে যাবেন, সেই ফোন নিয়ে দুই ডান হাতে এমন কাড়াকাড়ি হল যে হাত ফসকে টেলিফোনটাই পড়ে ভেঙে গেল। বাঁ-হাতে ঘড়ি পরবেন সে উপায় নেই, এক হাতে ঘড়ি পরতে গেলেই আর-এক হাত খাবলা মারে। একটু তবলা বাজানোর শখ আছে যতীনবাবুর। কিন্তু এখন দুটো ডান হাত এবং দুটো বাঁ-হাত মিলে তবলা ডুগিতে এমন সব আওয়াজ তোলে যে কহতব্য নয়। বরাবর বাঁ-হাতে চায়ের কাপ ধরার অভ্যাস তাঁর, সবে চুমুক দেবেন অমনি নতুন বাঁ-হাতটা উঠে এসে কাপটা এমন চেপে ধরল যে গরম চা চলকে পড়ে পেটে ফোসকা হওয়ার জোগাড়। বাজার করতে গিয়েও বিপত্তি। পুরোনো হাতে বাছাই বেগুন তুলছেন নতুন হাত টপাটপ কানা বেগুন তুলে ব্যাগে ভরে দিচ্ছে। বুড়ো ঢ্যাঁড়স, পাকা পটল, ধশা আলু কী থাকছে না আজকাল তাঁর বাজারে!

এঃ হেঃ! যতীনবাবুর তো তাহলে খুব বিপদ যাচ্ছে মশাই।

তা আর বলতে। তাই বলছিলুম, ভগবানের কাছে ফস করে কিছু চেয়ে বসবেন না। বেখেয়ালের লোক, কোনটা দিয়ে ফেলেন কে জানে। যা আছে তাই নিয়েই খুশি থাকুন মশাই বুঝলেন?

খুব, খুব।

কানাই সামন্তর দোকান

নাঃ, একশোটা টাকা জলেই গেল কানাই সামন্তর। তা এরকম কত টাকাই তো তার যায়। কি আর করা। কানাই কিন্তু পয়সাওলা লোকও নয়, বরং বড়ই গরিব। গাঁয়ের এক প্রান্তে তার ছোট মুদির দোকান। তেমন চলেও না। তার ওপর লোকে ধারবাকিতে জিনিস নিয়ে টাকা শোধও দিতে চায় না। তা মুশকিলে পড়েই কানাই সামন্ত সহজে বড়লোক হওয়ার ফিকির খুঁজছিল।

তা ফিকির কে না খোঁজে। কেউ কেউ ফিকিরের জোরে পয়সা বাগিয়েও তো নেয়। কিন্তু কানাইয়ের কপালটাই এমন যে, সে কেবল ফেরেববাজদের খপ্পড়ে পড়ে যায়।

এই তো মাস চারেক আগে প্রাতঃকালেই এক ডাকসাইটে সাধুবাবা এসে হাজির। যেমন পেল্লায় চেহারা, তেমনি বিরাট তার দাড়ি আর গোঁফ। হাতে সিঁদুর মাখানো মস্ত ত্রিশূল, মাথায় জটা। দেখলে ভক্তি শ্রদ্ধা হয়। এসে আধসের ছাতু আর এক পো গুড় চাইল। ভারী ভক্তির সঙ্গেই দিয়েছিল কানাই, সাধুবাবা তার ঝোলা থেকে থালা আর ঘটি বের করে টিপকলের জলে ছাতু মেখে এক চোপাটে উড়িয়ে দিয়ে যা একখানা বজ্রপাতের মতো ঢেঁকুর তুললেন যে পিলে চমকে যায়। দামটা চাইবার সাহসই হচ্ছিল না কানাইয়ের। হাতজোড় করে বসে রইল পায়ের কাছে।

সাধু এরপর বাইরের বেঞ্চিখানায় শুয়ে ঘণ্টা চারেক টানা ঘুম দিয়ে উঠল। সে কী নাকের ডাক রে বাবা। দুপুরে উঠে সেবার জন্য চাল ডাল চাইল, সঙ্গে আলু কুমড়ো পটল বরবটি যা ছিল ঘরে, নুন তেল এবং একটু ঘি-ও। ভয়ে ভয়ে তাও বের করে দিল কানাই। ঝোলা থেকে হাঁড়ি বের করে ইটের উনুনে কাঠের জ্বালে সের দেড়েকের মতো খিচুড়ি সাপটে আবার সেই উদগার। দিনান্তে ঝোলা থেকে একটা নুড়ি পাথর বের করে তার হাতে দিয়ে বলল, তোর সেবায় খুশি হয়ে এই পরশপাথর দিয়ে গেলুম। লোহায় ছোঁয়ালেই সোনা। বলে নিজের হাতের লোহার বালাটায় পাথরটা ঠেকাতেই সেটা হলুদবর্ণ ধারণ করায় কানাই আর চোখের জল সামলাতে পারল না। এতদিনে তার দুঃখ ঘুচল। সাধু তার জন্য যজ্ঞ করবে বলে পাঁচশো টাকা নিয়ে চলে গেল।

সাধু যেতে না যেতেই যেন ভগবানই একজন দূতকে পাঠিয়ে দিলেন। এক গরুর গাড়ি বোঝাই পুরোনো লোহালক্কর নিয়ে একটা বুড়ো লোক এসে হাজির। 'পুরোনো লোহা চাই গো' বলে হাঁক পাড়ছিল। তাকে আর হাঁকাহাঁকি করতে না দিয়ে দরদাম না করেই এক গাড়ি পুরোনো বালতি, ভাঙা ট্রাঙ্ক, জং ধরা শিক এই সব পাঁচ হাজার টাকায় কিনে ফেলল কানাই।

সেই সব এখনও দোকানের পাশে ডাঁই হয়ে পড়ে আছে, পরশপাথর ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে ক্ষয় করে ফেলেছে, কিছুই হয়নি।

তা কানাইকে এরকম আক্কেল সেলামি মাঝে মাঝেই দিতে হয়।

বছর দেড়েক আগেই এক ভণ্ড ফকির তাকে অক্ষয় ক্যাশবাক্স

গছিয়ে গিয়েছিল। মিষ্টি হাসি, মিঠি মিঠি বুলি, মিষ্টি চাউনি আর ভালো পোশাকটোশাক দেখে কানাই কুপোকাৎ। ফকির তার দোকান দেখে খুব আক্ষেপ করে বলল, ভালো লোকেদের কপাল খারাপই হয়। তবে গুরুর মেহেরবাণীতে এখন থেকে আর কানাইয়ের কষ্ট থাকবে না। সে তার পুঁটুলি খুলে একখানা কাঠের পুরোনো ক্যাশবাক্স বের করে তার হাতে দিয়ে খুলতে বলল। খুলে কানাই দেখে তাতে অন্তত শ' পাঁচেক টাকার তাড়া, ফকির টাকাটা তুলে নিয়ে বাক্স বন্ধ করে তাকে ফের খুলতে বলল। কানাই খুলে দেখে তাতে অবিকল আগের মতোই শ' পাঁচেক টাকা। ফকির বাক্সটা তাকে দিয়ে বলল, দিনে দুবারের বেশি খুলো না কিন্তু! বেশি লোভ ভালো নয়। এই অক্ষয় ক্যাশবাক্স তোমার সব দুঃখ ঘুচিয়ে দেবে। দরগায় সিন্নি চড়ানোর জন্য হাজার খানেক টাকা দক্ষিণা নিয়ে ফকির বিদেয় হল। ক্যাশবাক্স আজও দোকানঘরে পড়ে আছে। ওই দুবারই যা ফকিরের কেরামতিতে টাকা বেরিয়েছিল, তারপর থেকে ঠন ঠন।

এই পরশুই এক আখাম্বা তান্ত্রিক এসে হাজির, বিভীষণ চেহারা, পরনে রক্তাম্বর, দাড়ি গোঁফ, চুল নিয়ে একেবারে লকলক করছে। গুল্লু চোখে বেশ ব্যাঘ্রদৃষ্টি। বজ্রকণ্ঠে বলল, তোর তো দুঃখু রে!

যে আজ্ঞে বাবা, বড় কষ্টে আছি।

বাড়িতে পাঁঠা আছে?

আজ্ঞে না।

ফলার করানোর মতো কিছু নেই?

আজ্ঞে, দুধ চিঁড়ে হবে!

তাই নিয়ে আয়। সঙ্গে মর্তমান কলা।

তা তান্ত্রিক সেরটাক চিঁড়ে দুধ খেয়ে ভারী খুশি। বলল, পাঁঠা হলে আরও জমত রে। তা যাক, এই আয়নাখানা দিয়ে যাচ্ছি, আয়নার দিকে চেয়ে মা কালীকে স্মরণ করে তিনবার বলবি জিঞ্জিরি ফটাস! জিঞ্জিরি ফটাস! জিঞ্জিরি ফটাস! অমনি আয়নার ভিতর দিয়ে গুপ্তধনের হদিস পেয়ে যাবি। একেবারে ফটোগ্রাফের মতো। এবার মায়ের পূজোর বাবদ পাঁচশো এক টাকা বের কর দিকি।

তা কানাই এখন খানিক সেয়ানা হয়েছে। আভূমি পেন্নাম করে বলল, পাঁচশো পেরে উঠবো না বাবা, ক্যাশবাক্সে বড় জোর পঞ্চাশটা টাকা হতে পারে।

তান্ত্রিকের বড় তাড়া, বলল, তাই দে। আমার আবার আজ রাতের মধ্যেই মাধবপুর শ্মশানে পৌঁছোতে হবে।

টাকা নিয়ে একটা কাঠের ফ্রেমের সস্তা পুরোনো আয়না দিয়ে উধাও হল।

সেই আয়নায় গুপ্তধন কেন, নিজের মুখখানাও ভালো করে দেখা যায় না, এমন ময়লা।

নিজের আহাম্মকির কথাই আজকাল বসে বসে ভাবে কানাই। লোভেই না পাপ হয়, আর পাপেই তো বিনাশ, লোভে পড়েই না সে কতগুলো ঠগবাজ আর জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিল। ভবিষ্যতেও হয়তো পড়বে।

তবে জিনিসগুলো সে ফেলে দেয়নি, সেই পরশমনি, ক্যাশবাক্স আর আয়না সে যত্ন করে রেখে দিয়েছে। জিনিসগুলো জালি হলেও তাকে তো গুণাগার দিতে হয়েছে।

ক'দিন যাবৎ তার বউ নন্দরানি একটা আয়নার বায়না করছে। মুগবেড়ের হাট থেকে সারে বারো টাকায় একখানা আয়না অনেক দিন আগে ভাগে কিনে দিয়েছিল কানাই, যে আয়নাখানা হাত থেকে পড়ে ভেঙে যাওয়ায় বউ নন্দরানির ভারী অসুবিধে হচ্ছে। কিন্তু মুগবেড়ের হাট বসবে সেই শনিবার। হাট ছাড়া ভালো আয়না পাওয়াও যায় না। মাঝখানের তিনটে দিন কাজ চালিয়ে নেওয়ার জন্য সে তান্ত্রিকবাবার দেওয়া আয়নাটা একটু সাফ সুতরো করে দিয়েছে নন্দরানিকে।

সকালে দোকান খোলার আগে যখন চাট্টি মুড়ি আর বাতাসা খেতে বসেছে কানাই তখন নন্দরানি এসে বলল, ওগো এ কী আয়না দিয়েছ। এর ভিতর যে সব বিটকেল জিনিস দেখা যাচ্ছে।

কানাই উদাস হয়ে বলে, ও আয়নাটা ওরকমই। কোনওরকমে কাজ চালিয়ে নাও, তিন দিন পরই ভালো আয়না এনে দেব।

নন্দরানি রাগ করে বলে, না বাপু, আমি বরং কাঁসার থালায় মুখ দেখে সিঁদুর পরে নেব। এই ভূতুড়ে আয়না তোমার কাছেই থাক। বলে আয়নাটা তার পাশে রেখে চলে গেল।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুড়ির বাটি রেখে কানাই আয়নাটা নিয়ে উঠে পড়ল। দোকানে এসে জায়গামতো আয়নাটা রাখতে গিয়েও কী ভেবে একটু ভালো করে দেখল আয়নাটাকে। ঘষে মেজে একটু সাফসুতরো করায় আয়নাটা ঠিক আগের মতো ঘোলাটে নেই আর, কিছু যেন দেখাও যাচ্ছে।

ভালো করে দেখতে গিয়ে কানাইয়ের এক গাল মাছি। সত্যিই তো, আয়নায় নিজের মুখের বদলে অন্য কি সব যেন দেখা যাচ্ছে। একটু আলোতেও নিয়ে গিয়ে সে ভালো করে লক্ষ্য করে

দেখতে পেল বেশ আবছায়ার মধ্যে, যেন একটা অন্ধকার ঘরে একখানা সিন্দুকমতো বাক্স, আর তা থেকে একটা তালা ঝুলছে। আর সিন্দুকের পাশে দিয়েই খুব সরু একটা সিঁড়ি ওপর দিকে উঠেছে। আর কিছু বোঝা গেল না।

কানাই বজ্রাহতের মতো আয়নার দিকে চেয়ে বসে রইল। মনে হচ্ছে এটা একটা গুপ্তধনেরই সংকেত। কিন্তু এই ব্যাটা লোহার বাক্সটা কোথায় কোন মাটির নীচে পোঁতা আছে তা কে বলবে?

কানাইয়ের এখন ভারী মুশকিল হল। গুপ্তধনের হদিস একটা পাওয়া গেল বটে, কিন্তু ঠিকানা? সেটাই তো জানা নেই, আয়নাখানা ভক্তিভরে মাথায় ঠেকিয়ে সাবধানে লুকিয়ে রাখল সে। তারপর আকাশপাতাল ভাবতে বসল।

তার ভাবনার চোটে চার-চারজন খদ্দের এসে ফিরে গেল। একজন ময়দার খোঁজে এসেছিল, একটা বাচ্চা মেয়ে এসেছিল হলুদের গুঁড়ো কিনতে, একজন এল পোস্ত আর একজন এসেছিল সোডা নিতে। সবাইকে মাথা নেড়ে নেই বলে ফিরিয়ে দিল সে।

দিনকতক আয়না নিয়েই তার চব্বিশ ঘন্টা কাটছে। ফাঁক পেলেই আয়না মুখের সামনে ধরে বসে থাকে, কিন্তু দৃশ্যটার কোনও পরিবর্তন নেই, সেই তালা লাগানো লোহার সিন্দুক আর সরু সিঁড়ি।

নাওয়া খাওয়া গোল্লায় গেল কানাইয়ের। রাতে ঘুম হয় না। সারা দিন বিড় বিড় করে।

দিন পনেরোর মাথায় দুপুরবেলা যখন ফাঁকা পেয়ে দোকানঘরে বসে আয়নায় মজে আছে কানাই, তখন একজন কেষ্টবিষ্টু

চেহারার লোক এসে দোকানের সামনে একটা মোটরগাড়ি থেকে নামল। একটা হাঁক মেরে বলল, ওহে দোকানি, তোমার কাছে লবঙ্গ পাওয়া যাবে?

কানাই অম্লানবদনে বলে দিল, না নেই।

লোকটা একটু হেসে বলল, লবঙ্গ না থাকে, মৌরি তো আছে! আমার যে একটু মুখশুদ্ধির বড় দরকার হে!

অন্য দোকানে দেখুন না।

লোকটা বেশ হোঃ হোঃ করে হেসে উঠে হঠাৎ বলল, দোকানদারিতে মন দাও হে দোকানি, লক্ষ্মী তোমার ঘরেই পা বাড়িয়ে আছে। আয়নার গুপ্তধন তো মরীচিকা।

এই বলেই বাবুটি গাড়িতে উঠে ভোঁ করে চলে গেল, আর অবাক হয়ে কানাই দেখল আয়নাটা একদম অন্ধকার হয়ে গেছে। সেই সিন্দুক নেই, সিঁড়ি নেই, কিচ্ছু নেই, কানাইয়ের মাথায় বজ্রাঘাত। খানিকক্ষণ হতভম্ব বসে থাকার পর হঠাৎ তার সম্বিৎ ফিরল। বাবুটি শেষ কথাটা যেন কী বলে গেল? লক্ষ্মী তোমার ঘরেই পা বাড়িয়ে বসে আছে। আয়নার গুপ্তধন তো মরীচিকা! তাহলে কি লোকটা সব জানে?

কানাই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে তার দোকানের চারপাশটা ভালো করে দেখল, দেখল তার দোকানটা ভারী হতশ্রী। অযত্নে অনাদরে কেমন যেন লক্ষ্মীছাড়া। দোকানে মন নেই বলে তার দোকানে তেমন জিনিষপত্রের জোগান নেই, খদ্দের এসে ফিরে যায়। হিসেবপত্রও ঠিকমতো রাখা হয় না, খরিদ্দারদের সঙ্গে তেমন বিনয় বচনে কথাও বলে না সে। তাহলে এটাই কি তার অভাবের কারণ?

পরদিন থেকেই দোকানের পিছনে লেগে পড়ল কানাই। বিস্তর মেহনতে দোকানটা যথাসাধ্য সাফসুতরো করল। পাইকারি বাজার থেকে মেলা মাল তুলে এনে দোকান সাজাল। হিসেবের খাতা রাখল নতুন করে।

মাস ঘুরতে না ঘুরতেই বিক্রিবাটা বেড়ে দ্বিগুণ তিনগুণ। সারাদিন খদ্দেরের আনাগোনা। সন্ধের পর টাকা গুনতে হিমসিম খেতে হয়।

পরশমণি, ক্যাশবাক্স, আর আয়না সে ফেলেনি, তার আহাম্মকির স্মারক হিসেবে সেগুলো দোকানেই রাখা আছে, সেদিকে চেয়ে মাঝে মাঝে সে বিজ্ঞের মতো হাসে।

নফরগঞ্জের রাস্তা

ও মশাই, নফরগঞ্জে যাওয়ার রাস্তাটা কোন দিকে বলতে পারেন?

নফরগঞ্জে যাবেন বুঝি? তা আর বেশি কথা কি! গেলেই হয়। বেশি দূরের রাস্তাও নয়। নফরগঞ্জে একরকম পৌঁছে গেছেন বলেই ধরে নিন।

বাঁচালেন মশাই, স্টেশন থেকে এই রোদ্দুরে মাইল পাঁচেক ঠ্যাঙাচ্ছি। তিন তিনটে গাঁ পেরিয়ে এলুম, এখনও নফরগঞ্জের টিকিটিও দেখতে পাইনি।

আহা, বড্ড হয়রান হয়ে পড়েছেন মনে হচ্ছে! এই দাওয়াতেই বসে জিরিয়ে নিন কিছুক্ষণ। বেলা মোটে বারোটা বাজে। চিন্তা নেই।

তা না হয় বসছি। তা নফরগঞ্জ এখান থেকে কতটা দূর বলতে পারেন?

অত উতলা হচ্ছেন কেন? এই মানিকপুর গাঁকে তো অনেকে নফরগঞ্জের চৌকাঠ বলেই মনে করে। তা নফরগঞ্জে কার বাড়িতে যাবেন মশাই?

সে বলতে গেলে অনেক কথা বলতে হয়। গলাটাও শুকিয়ে এসেছে কিনা। তা একটু জল পাওয়া যাবে?

বলেন কি! মানিকপুরে জল পাওয়া যাবে না মানে? মানিকপুরের জল যে অতি বিখ্যাত। এখানকার জলে কলেরা,

সান্নিপাতিক, সন্ন্যাস রোগ, আমাশয়, বেরিবেরি সব সারে। এই যে ঘটিভরা জল, ঢক ঢক করে মেরে দিয়ে দেখেন দিকি, পাঁচ মিনিটের মধ্যে শরীরের বল ফিরে আসে কিনা।

বাঁচালেন মশাই, তেষ্টায় বুকটা কাঠ হয়ে আছে।

কেমন বুঝলেন জল খেয়ে?

দিব্যি জল, হুবহু জলের মতোই।

জলের মতো লাগলেও ও আসলে হল জলের বাবা। একবার পেটে সেঁধোলে আর উপায় নেই। লোহা খেলে লোহাও হজম হয়ে যাবে। রোগ-বালাই পালাই-পালাই করে পালাবে। হাতির বল এসে যাবে শরীরে।

তাই হবে বোধহয়। জল খেয়ে আমার বেশ ভালোই লাগছে। এবার তাহলে রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেই রওনা দিতে পারি।

আহা, সে হবে'খন। নফরগঞ্জ তো আর পালিয়ে যাচ্ছে না। তা কার বাড়ি যাবেন যেন?

কুঞ্জবিহারী দাস মশাইয়ের নাম শোনা আছে কি?

কুঞ্জবিহারী? তা কুঞ্জবিহারী কি আপনার কেউ হয়? শালা বা ভগ্নীপোত বা ভায়রাভাই গোছের?

না মশাই না, কুঞ্জবিহারীকে আমি কস্মিনকালেও চিনি না। তবে প্রয়োজনেই যেতে হচ্ছে।

তা ভালো, তবে কিনা ভেবেচিন্তে যাওয়া আরও ভালো।

কেন মশাই, ভেবেচিন্তে যাওয়ার কি আছে? মানুষের বাড়িতে কি মানুষ যায় না? তার ওপর মাথায় একটা দায়িত্ব নিয়েই যেতে হচ্ছে।

সেটা বুঝতে পারছি। প্রাণের দায় না হলে কি কেউ সাধ করে নফরগঞ্জের কুঞ্জবিহারীর ডেরায় গিয়ে সেঁধোবার সাহস করে?

আপকি কি বলত চাইছেন যে কুঞ্জবিহারী খুব একটা সুবিধের লোক নন!

সে কথা আবার কখন বললুম? না মশাই, আমি বড্ড পেট-পাতলা মানুষ। মনের ভাব চেপে রাখতে পারিনে। কি বলতে কি বলে ফেলেছি, ওসব ধরবেন না।

বলেই যখন ফেলেছেন তখন ঝেড়ে কেশে ফেললেই তো হয়। অসোয়াস্তি কমে যাবে।

আসলে কি জানেন কুঞ্জবিহারী বোধহয় খুবই ভালো লোক। তবে নিন্দুকেরা নানা কথা রটায় আর কি!

না মশাই, আপনি চেপে যাচ্ছেন। আপনাকে বলতে বাধা নেই যে, আমার ভাইঝির সঙ্গে কুঞ্জবিহারীর ছেলে বিপ্লববিহারীর বিয়ের সম্বন্ধ পাকা করতেই আসা।

বিপ্লববিহারী ওরে বাবা!

অমন আঁৎকে উঠলেন কেন মশাই! বিপ্লববিহারী কি ছেলে ভালো নয়। শুনেছি সে ভালো লেখাপড়া জানে। এমএসসি পাশ করে আরও কি সব পড়াশুনো করেছে! চাকরিও করে ভালো।

তা হবে। কত কিছুই তো শোনা যায়।

নাঃ, বড্ড মুশকিলে ফেলে দিলেন মশাই। ভাবগতিক তো মোটেই ভালো বুঝছি না। দাদাকে বারবার বললুম, ফুলির বিয়ের সম্বন্ধ অত দূরে কোরো না। কিন্তু দাদা কি আর শোনার পাত্র?

বেশ ফ্যাসাদেই পড়া গেল দেখছি। ও মশাই, একটু খুলে বলুন না, এখানে বিয়ে হলে আমার ভাইঝিটা কি জলে পড়বে?

ভাইঝি তো আপনার। তাকে জলে ফেলুন, ডাঙায় ফেলুন সে আপনার ইচ্ছে। কিন্তু আমি আর কথাটি কইছি না।

তা হলে আর কি করা! যাই, নিজের চোখে অবস্থাটা একটু দেখেই আসি।

আহা অত তাড়া কিসের? দুটো মিনিট বসেই যান। আমার মেয়েকে বলেছি, শশা দিয়ে দুটি মুড়ি মেখে দিতে। দুপুরবেলায় গেরস্থ বাড়িতে শুধু মুখে চলে গেলে যে অকল্যাণ হয়। ডাব পাড়তে গাছে লোক উঠেছে। এল বলে। ডাব খেয়ে মাথাটা ঠান্ডা করুন।

না মশাই, না! দুপুর গড়িয়ে গেলে চলবে না। সেখানে যে আমার দুপুরে খাওয়ার নেমন্তন্ন!

দেরি কিসের। সবে তো বারোটা। পথও বেশি নয়। কথা আছে।

আজ্ঞে, কথাই তো শুনতে চাইছি।

নফরগঞ্জের কুঞ্জবিহারী দাস সম্পর্কে জানতে চাইলে এ তল্লাটের গাছপালা, গরুবাছুরকে জিগ্যেস করলেও মেলা খবর পেয়ে যেতেন। এই দশ বরো বছর আগেও কুঞ্জগুণ্ডা দিনে তিনটে খুন না করে জলস্পর্শ করত না। প্রতি রাতে অন্তত গোটা দুই বাড়িতে ডাকাতি না করলে তার ঘুম হত না। আর রাহাজানি, তোলা আদায় কোন গুণটা না ছিল তার! তবে এখন বয়স হওয়াতে রোখ কিন্তু কমেছে। নিতান্ত দায়ে না পড়লে আর

বিশেষ লাশটাশ ফেলে না। তবে তার জায়গা এখন নিয়েছে ওই তার ছেলে বিপ্লববিহারী। তফাত হচ্ছে। বাপ মানুষ মারত দা কুড়ুল দিয়ে, ছেলে মারে বন্দুক পিস্তল দিয়ে।

বলেন কি মশাই! দাদা যে বলল, কুঞ্জবিহারী রীতিমতো ফোঁটা কাটা বৈষ্ণব। ভারী নিরীহ মানুষ। তার ছেলেটিও নাকি ভারী বিনয়ী। আর খুবই সভ্যভব্য।

হাসালেন মশাই, আপনার দাদার চোখে নিশ্চয়ই চালসে ধরেছে। এই যে আপনার মুড়ি আর ডাব এসে গেছে। রোদে তেতে পুড়ে এসেছেন, একটু খিদে তেষ্টা মিটিয়ে নেন তো?

আর খিদে চেষ্টা। আপনার কথা শুনে খিদে তেষ্টা তো মাথায় উঠেছে।

আহা, তা বললে কি আর চলে? তা ভাইজির বিয়ে দেওয়ার জন্য কি আর পাত্র জুটল না?

সেইটেই তো ভাবছি। দাদার তো দেখছি কাণ্ডজ্ঞানই নেই।

তা কুঞ্জগুন্ডা তার ছেলের বিয়েতে কত পণ নিচ্ছে? দু-চার লাখ টাকা হবে না?

না মশাই, সেরকম তো কিছু শুনিনি! বরং দাদা একবার কথা তোলায় নাকি কুঞ্জবিহারী তার দু-হাত ধরে কেঁদে ফেলে আর কি! লোকটা নাকি বলেছে, তাদের বংশেই পণ নেওয়ার কোনও রেওয়াজ নেই।

হুঁঃ! আপনিও বিশ্বাস করলেন সে কথা। আইনের ভয়ে প্রকাশ্যে না নিলেও গোপনে একটা বন্দোবস্ত হয়েছে ঠিকই। ধরে রাখুন, তিন থেকে পাঁচ লাখ টাকা হবেই।

কিন্তু দানসামগ্রী দিতেও যে বারণ করেছে। বলেছে, দানসামগ্রী আবার কিসের? আমার ছেলে যদি তার বউকে প্রয়োজনের জিনিস কিনে দিতে না পারে তবে আর তাকে যোগ্যপাত্র বলে ধরা যায় না।

হেঃ হেঃ, কথার মারপ্যাঁচ মশাই, কথার মারপ্যাঁচ। এখন ওসব বললে কি হয়। বিয়ের পর দেখবেন নানা ছুতোয় হরেক রকম ফিকির করে ঘাড়ে ধরে আদায় করবে।

আপনি তো আমাকে বড়ই টেনশনে ফেলে দিলেন মশাই। এখন এই বিয়ে কি করে ভাঙা যায় তাই ভাবছি। কথা একরকম পাকা হয়েই আছে। আজ দিন ঠিক করে নিয়ে যাওয়ার কথা আমার। পুরুতমশাই অপেক্ষা করছেন। বড় মুশকিলেই পড়া গেল দেখছি।

বিয়ে ভেঙে দেওয়াই ঠিক করে ফেললেন বুঝি!

তা ছাড়া আর উপায় কি বলুন।

আহা, শুনে বড় স্বস্তি পাচ্ছি। মেয়েটা বেঁচে গেল। তাহলে বরং আজ আর আপনার নফরগঞ্জে যাওয়ার দরকার নেই। বাড়ির পিছনে টলটলে পুকুরের জলে স্নান করে নিন, তেল গামছা সাবান সব আসছে ভিতরবাড়ি থেকে। তারপর দুপুরে দুটি ডাল-ভাত খেয়ে একটু জিরিয়ে নিয়ে বাড়িমুখো রওনা হবেন'খন। পাবদা মাছের ঝাল, সরপুঁটির সর্ষে ভাপা, রুই মাছের কালিয়া, ঝিঙে পোস্ত, সোনা মুগের ডাল, মুড়িঘণ্ট, চাটনি আর পায়েস হয়েছে। এতে হয়তো আপনার একটু কষ্টই হবে। তবু গরিবের বাড়িতে দুটি অন্নগ্রহণ না করলে ছাড়ছি না মশাই।

বাপ রে! বলেন কি? এত দূর এসে যদি ফিরে যাই তাহলে দাদা কি আর আমাকে আস্ত রাখবে। বিয়ে ভাঙতে হলে কুঞ্জবাবুর মুখের ওপরেই কথাটা কয়ে আসতে হবে। তাতে প্রাণ গেলেও কিছু নয়। আর ভোজ খাওয়ার মতো মনের অবস্থাও আমার নয়। আমাকে এখনই রওনা হতে হচ্ছে।

বলছিলাম কি, উত্তেজিত না হয়ে আর একটু বসুন। বলছিলাম কি, বিয়েটা একেবারে ভেঙে দেওয়ার আগে একটু অগ্রপশ্চাত ভাবাও তো দরকার। হুট বলে বিয়ে ভেঙে দেওয়াটাও ঠিক হবে না।

বলেন কি মশাই! এর পরও এই বিয়ে কেউ দেয়?

সেটা অবিশ্য ঠিক। তবে কিনা কুঞ্জবিহারী বা বিপ্লববিহারীর বদনাম থাকলেও তাদের সংসারে কিন্তু অশান্তি নেই। কুঞ্জগুন্ডার বউ কুসুম তো ভারী লক্ষ্মীমন্ত মহিলা। পুজোপাঠ, ব্রাহ্মণসেবা, দানধ্যান, অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো মেলা গুণ রয়েছে।

অ্যাঁ! এ যে বাঘের ঘরে ঘোঘ।

যে আজ্ঞে! বিয়ে হলে আপনার ভাইজি দুঃখে থাকবে না। কারণ, বিপ্লববিহারী বাইরে যেমনই হোক, আসলে ছেলে তেমন খারাপ নয়। ষণ্ডা হলেও সে ফিজিক্সে এমএসসি ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। তার ওপর এমবিএ। স্বভাবও ভারী ভালো। ভারী বিনয়ী, ভারী ভদ্রলোক।

এ যে উলটো গাইছেন মশাই।

আহা যার যা গুণ তা তো বলতেই হবে। আর কুঞ্জবিহারীও ষণ্ডাগুন্ডা বটে, কিন্তু বৈষ্ণবও বটে। রোজ গেঁড়িমাটি দিয়ে

রসকলি কাটে। ভিখিরিদের খাওয়ায়, জীবসেবা করে। গুণ কিছু কম নেই।

এ তো ফের উলটো চাপ মশাই।

উলটো চাপ নয় মশাই, মানুষের দোষের কথা শুধু বললেই তো হবে না। তার গুণের দিকটাও তো দেখা দরকার।

কুঞ্জগুন্ডার আরও গুণ আছে নাকি?

তা আর নেই। জীবনে কখনও এক পয়সা কাউকে ঠকায়নি। একটি কালো টাকাও তার তবিলে নেই। গরিব দুঃখীর জন্য প্রাণ দিয়ে করেন। গাঁয়ে চার খানা পুকুর কাটিয়েছেন, অনাথ আশ্রম খুলেছেন, স্বর্গত বাপের নামে অন্নসত্র দিয়েছেন, দুটো ইস্কুল তাঁর পয়সায় চলে। দানধ্যানের লেখাজোখা নেই মশাই।

তাহলে যে বলছিলেন লোক খুব খারাপ! খুন-টুন করেন।

আজ্ঞে তাও করে থাকতে পারেন। তবে কিনা খুনগুলো প্রমাণ হয়নি। অন্তত পুলিশের কাছে কোথাও রেকর্ড নেই। কেউ কেউ বলে আর কি।

না মশাই, আমার মাথা ঘুরছে। এবার রওনা না হলেই নয়।

আহা ব্যস্ত হবেন না। কষ্ট করে যাওয়ার দরকার নেই। স্বয়ং কুঞ্জবিহারীই এসে ভিতর বাড়িতে বসে আছেন।

এসব কি বলছেন। কুঞ্জবিহারী এখানে এসে বসে আছেন, এর মানে কি?

আজ্ঞে, ব্যাপারটা একটু গোলমেলে।

কীরকম?

এ গাঁয়ের নাম মানিকপুর নয়।

তাহলে?

আপনি আতাগঞ্জ পেরিয়ে ডানহাতি রাস্তা ধরে ফেলায় একটু ঘুরপথে ঝালাপুর হয়ে সোজা নফরগঞ্জেই এসে পড়েছেন যে! সোজা মানিকপুর হয়ে এলে রাস্তা দু-মাইল কম পড়ত।

তাহলে এ বাড়ি—?

আজ্ঞে এটাই কুঞ্জবিহারী দাসের বাড়ি। আমি হলুম গে তাঁর ভায়রাভাই নবকুমার হাজরা।

অ। তাই বলুন।

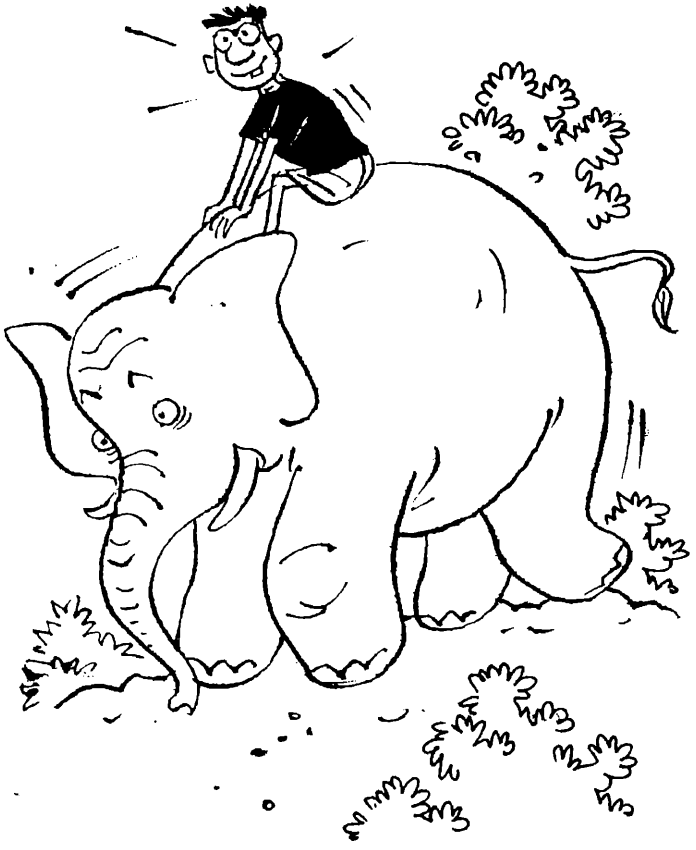

গয়ানাথের হাতি

একটা হাতি কেনার ভারী শখ ছিল গয়ানাথের। শখ সেই ছেলেবেলা থেকেই। গাঁয়ের মগনলালের হাতি ছিল। হাতিতে চেপে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াত। হাতির ঠমক চমকই আলাদা রকমের। ঘোড়া বা গাধাতেও চাপা যায় বটে, তবে তাতে তেমন সুখ হয় না। কেউ তাকিয়েও দেখে না তেমন। কিন্তু হাতি বেরোলে লোকে ভারী সম্মান করে পথ ছেড়ে দেয়।

তা গয়ানাথ হাতি কিনবে কী, তার নুন আনতে পান্তা ফুরোয়। চাষবাষ করে যা মেহনতটা হয় তার দশ ভাগের এক ভাগও ফসল হয়ে ঘরে ওঠে না। ধারকর্জ শোধ করতে করতেই মাঠের ফসল যখন ঘরে পৌঁছোয় তখন তার বারো আনাই খসে গেছে। তবে তা নিয়ে গয়ানাথের দুঃখও নেই, দুশ্চিন্তাও নেই। গরিবের ঘরে জন্মেছে, গরিবের মতোই বেঁচেই আছে, গরিবের মতোই জীবনটা যাবে। তারা গরিবেরই বংশ। তা বলে হাতির শখ তার যায়নি।

তার যে একটা হাতির শখ আছে সেটা অনেকেই জানে। ধনেশ বৈরাগী একদিন বলল, তা হাতি পুষলে খাওয়াবি কি বাপ? তোর নিজেরই পেট চলে না, আর হাতির পেট দেখেছিস তো, আস্ত একখানা ছোটখাটো বাড়ি ঢুকে যায়।

গয়ানাথ বলে, তা আর জানি না। হাতির অ আ ক খ সব জানি। খোরাকির চিন্তা পরে, আগে হাতিটা তো হোক।

জপেশ্বর সাধুখাঁ হাটবারে গরু বেচতে গোহাটায় গিয়েছিল। গয়াকে দেখে বলল, দূর বোকা, হাতি কেনা বেজায় লোকসান। আমার গরুটা বরং কিনে রাখ, দোবেলা সাত সের দুধ দেবে। হাতির দুধ তো আর মানুষে খেতে পারে না, দোয়ানোও কঠিন কাজ।

গয়ানাথ হেসে বলল, দুধেল হাতি না হলেও চলবে গো জপেশ্বরদাদা।

তবে সবচেয়ে অন্যরকম কথা কয় গয়ানাথের বউ জবা। সে বড় ধার্মিক মহিলা। পুজো-আচ্চা, ব্রত-পার্বন, উপবাস-কাপাস তার লেগেই আছে। সে বলে, ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি বাপু, হাতি নিয়ে আমার কাজ নেই। কবে হাতির পায়ের তলায় কার প্রাণ যায় ঠিক কি। হাতির চিন্তা ছেড়ে একটু ভগবানকে ডাকো তো। পরকালের কাজ হোক।

গয়ানাথ অবাক হয়ে বলে, ভগবানকে আবার ডাকাডাকির কি আছে। তাঁর সঙ্গে তো আমার নিত্যি দেখা হয়।

জবা ভয় খেয়ে বড় বড় চোখে চেয়ে বলে, ওগো, ভগবানকে নিয়ে মিথ্যে কথা বলতে নেই। তাতে পাপ হবে যে!

কিন্তু গয়ানাথের মুশকিল হল, কিছুদিন যাবৎ দুপুরবেলায় বাস্তবিকই বটগাছের তলায় ভগবান এসে থানা গেড়ে বসেন। বুড়োসুড়ো মানুষ। একটা চটের থলিতে করে হুঁকো, তামাক, টিকে নিয়ে আসেন। গাছতলায় একখানা আসন পেতে বসে গুড়ুক গুড়ুক তামাক খায়। মাঠে চাষের কাজ করতে করতে আড়ে আড়ে দেখে গয়ানাথ।

একদিন গিয়ে পেন্নাম করে জিগ্যেস করেছিল, আপনি কে আজ্ঞে, কোথা থেকে আগমন হলেন?

বুড়োমানুষটা ভারী খুশিয়ান হাসি হেসে বলে, আমি হলুম গে ভগবান, বুঝলি! হ্যাতান্যাতা লোক নই, স্বয়ং ভগবান!

বাপ রে! ডবল পেন্নাম হই কর্তা, আপনিই তাহলে তিনি?

তাহলে আর বলছি কী? তা কিছু যাদুটাদু দেখতে চাস নাকি?

জিব কেটে গয়ানাথ বলে, আরে না। আপনার মুখের কথাতেই আমার পেত্যয় হয়েছে।

তা তুই কত বড় হাতি চাস বল তো!

গয়ানাথের মুখ খুব উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে বলল, আজ্ঞে হাতিই যদি হয় তাহলে তো বড় হওয়াই ভালো, কি বলেন কর্তা?

তা বটে। হাতি ছোটখাটো হলে আর সুখ কি? হাতি বলে টের পেতে হবে তো!

যে আজ্ঞে। তবে কিনা হাতির বড় দাম শুনেছি।

আচ্ছা, তুই মন দিয়ে চাষবাস কর তো। হাতির সময় হোক তখন ঠিক হাতি এসে হাজির হবে।

তা ভগবান প্রায়ই এসে গাছতলায় বসে থাকেন। তার মেহনত দেখেন। তার সুখ দুঃখের কথাও শোনেন। আর গয়ানাথ মাঝে মাঝে ভগবানের তামাক সেজে দেয়, পা টিপে দেয়, বাতাসও করে।

বউ কথাটা বিশ্বাস করল না দেখে গয়ানাথ মাথা চুলকে বলল, তাই তো! ভগবানকে পেতে হলে অনেক পুণ্যিটুন্যি করতে

হয় শুনেছি, তপস্যাও লাগে, কিন্তু আমার তো কিছুই নেই। তাহলে বোধহয় দিনের বেলাতেই আমি জাগা-স্বপ্ন দেখি। ভগবান কি আর তুচ্ছ মানুষের কাছে ধরা দেন।

তা সেদিনই ভগবান বললেন, হ্যাঁ রে, তোর আমাকে এত সন্দেহ কেন? জাদুটাদু যদি দেখতে চাস সে অন্য কথা।

আজ্ঞে না কর্তা, বউ বলছিল কিনা, তাই একটু ধাঁধায় পড়ে গিয়েছিলাম।

বুড়োমানুষ তামাক খেয়ে ভারী আয়েস করে গাছে ঠেস দিয়ে বসে ট্যাঁক থেকে একটা চোপসানো ন্যাতানো বেলুন বের করে বললেন, আজ তোর জন্য একটা হাতি নিয়ে এসেছি।

হাতি! কই হাতি?

এই যে দেখছিস না।

কর্তা, ও তো একটা বেলুন মনে হচ্ছে।

ওরকম মনে হয়, যা দেখছিস সবই তো আদতে বেলুন। এই যে ফুটো দেখছিস এটাতে কষে ফুঁ দে তো বাবা।

তা গয়ানাথ ফুঁ দিল। আর তাজ্জব কাণ্ড। যত ফুঁ দেয় ততই বেলুনটা ফুলে একটা হাতির আকার নিতে থাকে।

ভগবান বলেন, যত বড় হাতি চাস তত ফুঁ দিয়ে যা।

বেলুনটা যখন ফুলে বেশ একটা পেল্লায় হাতির সাইজ হল তখন একটা সুতো দিয়ে ফুটোটা বেঁধে দিয়ে বললেন, এই নে তোর হাতি।

হাতিটা দিব্যি দাঁড়িয়ে শুঁড় দোলাতে লাগল, দু-একবার হাতির ডাকও ছাড়ল।

গয়ানাথ তাজ্জব হয়ে বলে, বেলুন থেকে যে হাতি হয় তা আমার জানা ছিল না কর্তা! কিন্তু এই হাতিকে খাওয়াতেও তো হবে!

ভগবান বলেন, তারও ভাবনা নেই। খাওয়ার আগে খানিকটা হাওয়া ছেড়ে দিবি, দেখবি যখন একটা কুকুরছানার মতো ছোট হয়ে গেছে তখন হাওয়া বন্ধ করে তোর পাতের এক মুঠো ভাত দিস, তাতেই দেখবি হেউ-ঢেউ হয়ে যাবে। আর হাতি রাখার জন্য হাতি শালেরও দরকার নেই। বালিশের পাশে ঘুম পাড়িয়ে রাখবি। আর বড় হাতিতে তোর বউ ভয় পেলে ছোট করে নিবি। তখন হাতি তোর ছেলেপুলের সঙ্গে দিব্যি খেলা করতে পারবেখন।

মহা খুশি হয়ে সেদিন বিশাল হাতিতে চেপে বাড়ি ফিরল গয়ানাথ, সারা গাঁ ঝেঁটিয়ে হাতি দেখতে এল। গয়ানাথের বউয়ের গালে হাত। আর তার ছেলেপুলেদের সে কী আনন্দ!

গাঁয়ের মোড়ল-মাতব্বররা তুমুল মিটিং-এ বসে গেল, গয়ানাথের মতো এমন হাড়হাভাতে মানুষ হাতি কিনে ফেলল, এ তো সাংঘাতিক কথা! জিগ্যেস করলে সে হাতজোড় করে কেবল বলে, ভগবান দিয়েছেন, নইলে আমার সাধ্যি কি যে হাতি কিনব! কিন্তু মোড়লরা ভগবানের ব্যাপারটা মোটেই বিশ্বাস করল না। বলল, এর মধ্যে একটা প্যাঁচ আছে। গয়ানাথ নিশ্চয়ই গুপ্তধন পেয়েছে।

কয়েকদিনের মধ্যে গাঁয়ে জানাজানি হয়ে গেল যে, গয়ানাথের হাতির সংখ্যা মোটেই একটা নয়। এক পাল এবং নানা সাইজের

হাতি। সকালে গয়ানাথ তার বিশাল হাতিতে চেপে মাঠে চাষ করতে যায়। দুপুরে তাকে ভাত পৌঁছে দিতে তার বউ যখন যায় তখন যায় একটা ছোটখাটো হাতিতে চেপে। আবার বিকেলে গয়ানাথের ছেলেপুলেরা যে হাতিটার সঙ্গে খেলা করে সেটা একটা গরুর সাইজের। আর গাঁয়ের বিখ্যাত চোর নটবর দাস স্বচক্ষে দেখেছে, গয়ানাথের একটা কুকুরছানার মতো ছোট হাতিও নাকি আছে। আর সেটা গয়ানাথের শিয়রের কাছে গুটিসুটি মেরে শুয়ে ঘুমোয়।

মোড়ল-মাতব্বররা তাকে ডেকে বলল, দেখ, গুপ্তধন যদি পেয়েই থাকিস তাহলে তাতে আমাদেরও একটা পাওনা হয়। ভালো চাস তো আধাআধি বখরা করে নে। নইলে ভালো হবে না। যার এবেলা ভাত জুটলে ওবেলা জোটে না তার চার-পাঁচটা হাতি হয় কী করে? গয়ানাথ ফের হাত জোড় করে বলে, সবই ভগবানের ইচ্ছে।

তার বউ জবা একদিন বলল, ওগো, ভগবানের সঙ্গে যখন তোমার এতই ভাব তখন আর একটু চেয়েই দ্যাখো না! আমাদের তো এত অভাব। শুধু হাতি হলেই তো হবে না।

তা কী চাইব?

এই একখানা সাতমহলা বাড়ি, সাত ঘড়া মোহর, সাত কলসি হীরে-মুক্তো।

তা সে আর বেশি কথা কী? বলবখন।

সেদিন ভগবান গাছতলায় বসেছেন। গয়ানাথ তাঁকে পাখার হাওয়া করতে করতে বলল, আজ্ঞে বাবা, একটা কথা ছিল।

ভগবান হুঁকোয় টান দেওয়া থামিয়ে বললেন, সাত মহলা বাড়ি, সাত ঘড়া মোহর আর সাত কলসি হিরে-মুক্তো তো! তাতে হবে তো তোর? আর কিছু লাগবে না?

মাথা চুলকে গয়ানাথ বলে, বউ তো আর কিছু বলেনি।

ভগবান মিটিমিটি হেসে বলেন, সাত মহলার জায়গায় চৌদ্দ মহলা বাড়ি হলে তো আরও ভালো, চৌদ্দর জায়গায় চৌষট্টি মহল হলে আরও আনন্দ—কি বলিস? আর সাত ঘড়াই বা কেন, ভগবান তো তোকে সাত হাজার ঘড়া মোহর দিতে পারে, আর হিরে-মুক্তোও সেই পরিমাণ।

গয়ানাথ শুকনো মুখে বলে, আমি গরিব মানুষ, অত কি সামলাতে পারব?

আহা, সামলানোর জন্য মাইনে দিয়ে লোক রাখবি। তখন কি আর তুই আজকের গয়ানাথ থাকবি? কেষ্ট বিষ্টু হয়ে উঠবি যে, সমাজ তোকে দু-বেলা সেলাম ঠুকবে। ভালো হবে না?

গয়ানাথ খুব চিন্তিত মুখে বলে, শুনে ভালো লাগছে না বাবা।

তাহলে ভালো করে ভেবে দ্যাখ গিয়ে। বউয়ের সঙ্গেও পরামর্শ করিস। যা চাস তাই পাবি। তবে—

তবে কী বাবা?

এই গাছতলায় রোজ দুপুরে যে এসে বসতুম সেটা আর হবে না। তোকে দিয়ে থুয়ে, একটা হিল্লে করে দিয়ে আমাকে এবার পাততারি গুটোতে হবে।

শুনে গয়ানাথের বুকটা কেমন করে উঠল। বলল, বাবা, তুমি

না এলে যে চারদিক বড় ফাঁকা হয়ে যাবে।

দুর বোকা! আমি না এলেই কি! তোর কত লোকলস্কর হবে, কত নামডাক হবে। কত খাতির হবে তোর!

রাত্রিবেলা বউয়ের কাছে সবটাই খুলে বলল গয়ানাথ। জবা বলল, আহা, ভগবানবাবা এসে গাছতলায় না-ই বা বসলেন। আমি তাঁর জন্য সোনার সিংহাসন বানিয়ে দেব। রোজ পোলাও পায়েস ভোগ দেব, ঠাকুরের সোনার গড়গড়া হবে, তুমি বরং ওটাই চেয়ে নাও। আর রোদে জলে ভগবানের গাছতলায় বসে কষ্ট করার দরকারই বা কি!

কথাটা কানে যেন ভালো শোনাল না গয়ানাথের। তার বেশি বুদ্ধিশুদ্ধি নেই। ভালো-মন্দ বিচার করার ক্ষমতাও কম। সে শুধু বোঝে, বুড়োমানুষটা এসে ওই যে গাছতলায় বসে থাকেন ওতেই তার বুক ভরে যায়।

পরদিন হাতির হাওয়া খুলে দিয়ে বেলুনটাকে ট্যাঁকে গুঁজে মাঠে গেল গয়ানাথ। তারপর দুপুরে ভগবান এসে গাছতলায় বসতেই তাড়াতাড়ি গিয়ে তামাক সেজে হাতে হুঁকোটা ধরিয়ে দিয়ে একটা প্রণাম করে উঠল। ট্যাঁক থেকে ন্যাতানো বেলুনটা বের করে বলল, এই নাও বাবা, তোমার জিনিস, আমার হাতির শখ মিটে গেছে।

বলিস কি?

আজ্ঞে, দুনিয়ার সব জিনিসই যে ফোলানো জিনিস, ফোঁপড়া, তা আমি টের পেয়েছি।

তা কি ঠিক করলি?

ওসব মোহর টোহরে আমার দরকার নেই। আধপেটা খেয়ে থাকব, তবু রোজ তোমাকে গাছতলায় এসে বসে থাকতে হবে।

ভালো করে ভেবে দ্যাখ।

ভাবতে আমার বয়েই গেছে। অত বুদ্ধিও নেই। আমার ভাবনা তুমিই ভাবো।

ভগবান গুড়ুক গুড়ুক তামাক খেতে খেতে খুব হাসলেন। যেন কথাটা শুনে ভারী আহ্লাদ হয়েছে তার।

রুণু

লালটু বৈরাগী ছিল জমিদারের মাহুত। বেশি বয়স নয় তার। বাইশ-তেইশ হবে, আর যে হাতিটায় সে মাহুত হয়ে চাপত সেটা ছিল বিশাল আকারের। রাস্তা দিয়ে যখন চলত মনে হত একটা পাহাড় হেঁটে যাচ্ছে।

বারবাড়ির মাঠে আমরা খেলতাম, খেলুড়িদের মধ্যে সবচেয়ে দুষ্টু ছিল রুণু নামের একটা ছেলে, তার মতো বাঁদর ছেলে কমই হয়। ছ্যাকরাগাড়ির ঘোড়াগুলিকে গাড়োয়ানরা ওই মাঠে ছেড়ে দিয়ে যেত ঘাস খাওয়ার জন্য। রুণু নারকেলের দড়ি দিয়ে লাগাম বানিয়ে সেই ঘোড়াগুলোর পিঠে চড়ে উত্যক্ত করে মারত। তার পকেটে সবসময়ে থাকত গুলতি। কাকে যে টিপ করবে তার ঠিক নেই, ফকেরুদ্দিনকে এমন গুলতি মেরেছিল যে দম বন্ধ হয়ে সে চোখ উলটে ফেলেছিল। যার ওপর রাগ হত তাকে বিচুটি গাছ তুলে এনে তাড়া করত। স্কুলের ক্লাসে, পাড়ায় এবং বেপাড়ায় মারপিট লেগেই থাকত তার। প্রতিদিন তার শরীরে নতুন নতুন কাটা বা ফোলা বা কালশিটের দেখা পাওয়া যেত। যেমন মারত তেমনি মার খেতও প্রচুর।

সেই রুণু একদিন দৌড়ে গিয়ে জমিদারের হাতির সামনে দাঁড়িয়ে গেল। লালটু রাগ করে বলল, তোর আক্কেল নেই! হাতির পায়ের তলায় গেলে কী হত জানিস?

তা তুমি আছ কী করতে? হাতি সামলাতে পারো না?

না পারলে এতক্ষণে কী হত জানিস?

খুব জানি। একটু হাতিতে চড়াও না লালটুদা।

সে উপায়ে নেই। এখন যাচ্ছি হাতি চান করাতে, দেরি হয়ে গেলে মুশকিল।

একটু চড়াও না লালটুদাদা, ও লালটুদাদা গো, পায়ে পড়ি।

উরেব্বাস রে! বামুনের ছেলে হয়ে ওকথা বলতে আছে?

আমার যে পাপ হবে রে! আচ্ছা, হাতিকে বসাচ্ছি, সাবধানে চড়বি।

হাওদা নেই, বস্তা-টস্তা বাঁধা নেই, হাতির খোলা পিঠে চড়া কিন্তু ভারী শক্ত ব্যাপার, কারণ হাতির বেজায় চওড়া পিঠে দু-ধারে পা ঝুলিয়ে বসবার উপায় নেই, হাওদা না থাকায় ধরার মতোও কিছু থাকে না বলে সবসময়েই পড়ে যাওয়ার ভয়, কারণ হাতি চলে হেলে-দুলে, আর একটা অসুবিধে হল হাতির গায়ের লোম, যেগুলো ছুঁচের মতো গায়ে বেঁধে।

কিন্তু হাতি চড়ার আনন্দে ওসব অসুবিধে আর কী গায়ে মাখে। হাতি বসতেই হইহই করে ছেলেপুলেরা হাঁচড়ে-মাচড়ে উঠে পড়ল তার পিঠে, হাতি উঠে দাঁড়ানোর সময় সে যেন ভূমিকম্পের অবস্থা, সওয়ারিরা পড়ে যায় আর কী, উপুর হয়ে হাতির লোম খামচে ধরে কোনওরকমে সামাল দেওয়া।

হেলেদুলে যখন হাতি চলছে তখন মনে হচ্ছে আমাদের চারদিকটাই দোল খাচ্ছে, সে এক আশ্চর্য অনুভূতি।

পড়া পারত না বলে স্কুলে প্রথম পিরিয়ড থেকেই রুণুকে নানারকম শাস্তি পেতে দেখতুম, হয় বেঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, নয়তো ক্লাসের বাইরে নীলডাউন, আর নাহলে নানুবাবুর

ক্লাসে হাত পেতে বেত খাচ্ছে। কিন্তু ওসব ছিল তার গা-সওয়া। একবার ক্লাসে মারপিট করায় মনিটর তার নাম লিখেছিল লিস্টিতে। প্রাণেশবাবু ক্লাসে এসেই তার চুল ধরে মাথাটা নামিয়ে পিঠে বিরাশি সিক্কার এক থাপ্পড় মারলেন। সেই শব্দে ক্লাস কেঁপে উঠল। রুনু নির্বিকার ভাবে দাঁড়িয়ে কানে আঙুল দিয়ে পরিষ্কার করতে করতে বলল, মেরে ভালোই করলেন স্যার। সকালে নদীতে চান করতে গিয়ে কানে জল ঢুকে গিয়েছিল, থাপ্পড়ের চোটে সেটা বেরিয়ে গেছে, আর যাবে কোথায়, এই কথা শুনে প্রাণেশবাবুর সে কী মার রুণুকে!

হ্যাঁ, ওই সাঁতার, স্কুলে যাওয়ার অনেক আগেই রুণু গিয়ে ব্রহ্মপুত্রের জলে নেমে পড়ত। জলের নেশা ছিল তার, অন্তত দু-ঘণ্টা ধরে সে সাঁতরাত। ডুবত, উঠত, চিৎসাঁতার, ডুবসাঁতার সবকিছুতেই ওস্তাদ ছিল সে, অতক্ষণ জলে থাকায় গা সাদা হয়ে যেত তার। তারপর দাদু বা দাদা কেউ এসে তাকে হাত ধরে টেনে তুলে বাড়ি নিয়ে যেত।

তাকে যিনি পড়াতে আসতেন সেই নীতিন মাস্টারমশাই মাঝে মাঝে অবাক হয়ে বলতেন, তোমার মাথা তো খারাপ নয়, তবে পরীক্ষায় কম নম্বর পাও কেন?

আমার বেশি লিখতে ভালোলাগে না।

বেশি লেখার তো দরকার নেই, কারেকট লিখলেই হল।

আমার ভালো ছেলে হতে ইচ্ছে করে না।

কী মুশকিল! তুমি কি ইচ্ছে করে ভুল লিখে দিয়ে আসো?

রুণু চুপ।

নিরীহ নীতিনবাবু বলেন, আমার কাছে যখন পড়া দিচ্ছো

তখন ভুল হচ্ছে না, কিন্তু ইস্কুলে গেলেই ভুল! এরকম তো হওয়ার কথা নয়।

মা সব শুনে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে বলেন, তুই এমন কেন করিস বাবা? তোকে লোকে ভুল বুঝলে যে আমার বড় কষ্ট হয়।

রুণু মাকে জড়িয়ে ধরে গায়ে মুখ গুঁজে বলে, আমি তো খারাপ ছেলে মা!

শোনো কথা! কে তোকে খারাপ বলে রে? দুষ্টু? সে তো অনেকেই ছেলেবেলায় দুষ্টু থাকে। দুষ্টু তো বুদ্ধিমানের লক্ষণ।

সেবারে রুণু পরীক্ষায় ফার্স্ট হল না বটে, কিন্তু সেকেন্ড হল। স্কুলের সবাই অবাক, যে ছেলে সারা বছর পড়া পারে না, সে কী করে এক ঝটকায় এত নম্বর তুলে ফেলল!

নাগমশাই গম্ভীর হয়ে বললেন, নিশ্চয়ই টুকেছে।

হেডস্যার এমদাদ আলি বিশ্বাস রাশভারী মানুষ। মাথা নেড়ে বললেন, টুকলে পাশ নম্বর হয়তো ওঠে, কিন্তু স্ট্যান্ড করা যায় না। কারণ টোকা দেখে কপি করতে অনেক সময় লাগে, টুকলিবাজরা কখনও ফার্স্ট-সেকেন্ড হয় না।

রুণুর একটু গুণও ছিল। সে কখনও কোনও ফড়িং-এর ডানা ছিঁড়ে দেয়নি, পাখি বা কুকুরকে ঢিল মারেনি, কানা-খোঁড়া কাউকে কখনও খ্যাপায়নি, সে কুকুর পোষে, তার একটা ডানা-কাটা বুলবুলি পাখি আছে। পাখিটাকে কেউ ডানা কেটে ছেড়ে দিয়েছিল, উড়তে পারছিল না। তাকে যত্ন করে সে খাঁচায় রেখেছে। আকাশের দিকে তাকালে তার মন খারাপ হয়ে যায়।

সে জেনেছে আকাশের নীল ছাদটা আসলে কোনও ছাদ নয়, আসলে আকাশের কোনও সীমানা নেই। এত বড় এত বিশাল যে ভাবতে গেলেই তার মাথা ঝিমঝিম করে, মনে হয়, বিশ্বজগৎটা একটু ছোট হলে বড় ভালো হত। কেন যে হল না!

নদী আর দাদু, রুণুর সবচেয়ে প্রিয় মানুষটি হল দাদু। দাদুর কাছে রোজ রুণুর নামে কত নালিশ জমা হত। কার আম, কার জাম, কার লিচু বা পেয়ারা পেড়ে এনেছে। কার টিনের চালে ঢিল মেরেছে, কার ছেলেকে ঘুঁষি মেরে নাক ফাটিয়ে দিয়ে এসেছে, দাদু গম্ভীর হয়ে শোনেন আর বলেন 'হুঁ'। ওই 'হুঁ'-তেই সব শাসন থেমে থাকে। সেই আততায়ী নাতিকে নিয়েই দুপুরে এক পাতে খেতে বসেন তিনি। পরম স্নেহে নিজে হাত গুটিয়ে নাতিকে ইচ্ছেমতো পাত লণ্ডভণ্ড করতে দেন।

আর বহমান ওই নদী। নদীর কোনও নীরবতা নেই। চির প্রগলভ নদীর ভাষা বুঝবার কত চেষ্টা করেছে সে, পারেনি। কিন্তু তবু কখনও-সখনও খেলা ফেলে, দুষ্টুমি ভুলে, খিদে চেপে ঘণ্টার পর ঘণ্টা উদাস হয়ে বসে থেকেছে নদীর ধারে। যদি নদীর কথা বোঝা যায়। কত দূর থেকে কত গল্প বয়ে আনে নদী, কত শহরের প্রতিবিম্ব তার বুকে লুকিয়ে থাকে, কত মানুষের স্পর্শ।

জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে রেলগাড়িতে চেপে একবার কোথাও যাচ্ছে রুণু। তখন ছোট, তার মন ভালো করার জন্য জ্যাঠামশাই একটা রসগোল্লা কিনে দিয়েছেন তার হাতে। রসগোল্লার মতো কিছুই হয় না। পেটুক রুণু হাঁ করে সবে কামড় বসাতে যাবে,

ঠিক সেইসময়ে আকাশ থেকে লটপট করতে করতে একটা মস্ত চিল এক ঝটকা মেরে রসগোল্লাটা কেড়ে নিয়ে গেল। আর তার ধারালো নখের আঁচড়ে ডান হাতের একটা আঙুল কেটে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছিল। জ্যাঠামশাই অপ্রস্তুত, রুমাল বেঁধে হাতের রক্ত সামাল দিচ্ছেন।

রুণু কাঁদেনি, খুব অবাক হয়েছিল। চিলের দুষ্টুমির কথা সে জানে, আগেও কতবার দোকান থেকে কচুরি বা জিলিপি আনার সময় চ্যাঙারি কেড়ে নিয়ে গেছে। নতুন তো নয়, কিন্তু এই যে রসগোল্লাটা হাতে এই ছিল—এই নেই হয়ে গেল। এই বিস্ময়টাই তার যেতে চায় না। ডান হাতের সেই হঠাৎ শূন্যতা সে অনেকদিন ধরে টের পেত।

কেনারাম

গিরিজাবাবু নাকি?

যে আজ্ঞে। আমি গিরিজা পুততুণ্ডই বটে। তা আপনি?

আমাকে চিনবেন না। আমার নাম করালী ঘোষ। ভীমপুরে সাত পুরুষের বাস।

অ, তা ভালো কথা। এখানে কি কাজে আগমন?

কাজে তেমন কিছু নয়। গরু খুঁজতে বেরিয়েছি।

গরু খুঁজতে এত দূর! ভীমপুর তো না হোক চোদ্দো-পনেরো মাইল দূর হবে। বাড়ির আশেপাশেই খুঁজে দেখুন, হারানো গরু পেয়ে যাবেন।

গরু হারালে তো হারানো গরুর কথা ওঠে মশাই। আমার যে গরু হারায়নি।

তা হলে যে বললেন, গরু খুঁজতে বেরিয়েছেন।

তা অবশ্যি ঠিক। গরু খুঁজতে বেরোনো বটে। তবে কিনা সেটা হারানো গরু নয়।

তবে কি গরু কিনতে বেরিয়েছেন নাকি?

আজ্ঞে না। আমাদের গোয়ালে বারোটা গরু। গোশালায় আর তেমন জায়গাও নেই কিনা। গরু গোঁজা খোঁজা আমার একটা নেশা বলতে পারেন।

গরু খোঁজার নেশা। এরকম তো কখনও শুনিনি মশাই। ওরকম নেশা আবার হয় নাকি?

ঠিকই বলেছেন। গরু খোঁজার অভ্যাসকে ঠিক নেশাও বলা

যায় না বটে।

ভালো কথা, আপনি দেখছি আমার নাম জানেন। কিন্তু আমি তো তেমন কেষ্টবিষ্টু মানুষ নই! নামটা জানলেন কী করে?

ওই পুবের মাঠে একটা বেশ নধরকান্তি সাদা রঙের গরু দেখে লোকজনকে জিগ্যেস করলাম, গরুটা কার।

তা একজন নস্করবাবু বললেন, গরুটা গিরিজাবাবুর। সঙ্গে এ-ও বললেন, চামার মশাই, চামার। আটটা গরু দু-বেলা না হোক বিশ কিলো দুধ দিচ্ছে, তবু পঁচিশ টাকার এক পয়সা কমে দুধ বিক্রি করবে না।

বটে! নস্করের এত বড় সাহস!

চেনেন নাকি নস্করবাবুকে?

কে না চেনে নচ্ছারটাকে? মোটে আধসের করে দুধ নিত, তাও তিন মাসের টাকা বাকি। ছ'মাস ঘুরে 'তাগাদার পর তাগাদা দিয়ে তবে চার কিস্তিতে টাকা আদায় করা গেছে। ওর মুখ দেখলে পাপ হয়।

তা হতে পারে। তবে কিনা নস্করবাবু আমাকে বিশুর চায়ের দোকানে এক ভাঁড় চা খাইয়েছেন। সঙ্গে দুটো কুকিস বিস্কুট।

তাতে কি মাথা কিনে নিয়েছে নাকি? চা আর বিস্কুটেই কাৎ হয়ে পড়বেন না যেন। কেনারাম নস্কর অতি ধুরন্ধর লোক। মতলবের বাইরে এক পয়সা খরচ করার পাত্র নয়। সেবার পাত্রপক্ষ ওর মেয়েকে দেখতে এসে ট্যারা বলেছিল বলে মিষ্টির প্লেট তুলে নিয়ে গিয়েছিল সামনে থেকে।

এঃ, এ তো মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়া। নাঃ, এ কাজটা কেনারাম নস্কর মোটেই ভালো করেননি। তা কেনারামবাবুর মেয়ে সত্যিই ট্যারা নাকি?

ট্যারা বলতে ট্যারা! বেজায় ট্যারা মশাই। তার ওপর বেঁটে, কালো, দাঁত উঁচু। ওই কেনারামের মতোই চেহারা।

বলেন কি মশাই! তা হলে কি আমি দিনে-দুপুরে ভুল দেখলুম! কেনারাম নস্করকে তো আমার দিব্যি ফরসা বলেই মনে হল! আর বেঁটে তো নন। দিব্যি লম্বা চেহারা! ট্যারা কিনা সেটা অবিশ্যি ভালো করে লক্ষ করেনি। নয় বলেই যেন মনে হচ্ছে।

তা সে যাই হোক, কেনারাম মানুষ মোটেই ভালো নয়। ওর সঙ্গে আপনি মোটেই মেলামেশা করতে যাবেন না যেন! এই গাঁয়ে তো একঘরে।

গরু খুঁজতে বেরিয়ে কি মুশকিলে পড়া গেল মশাই।

কেন, মুশকিলটা কীসের?

প্রথম মুশকিল হল, মানুষের খিদে-তেষ্টা বলে একটা ব্যাপার আছে। তারপর ধরুন, পেটপুরে খেলে দুপুরে আমার বড্ড ঘুম পায়, তার ওপর নরম বিছানা না হলে আমার মোটে ঘুমই আসে না। তা কেনারামাবাবু পই-পই করে বলে দিয়েছেন আজ মধ্যাহ্নভোজনটা যেন আমি তাঁর বাড়িতেই সারি। কিন্তু আপনার কথা শুনে তো বড় দমে গেলুম মশাই। কেনারাম নস্কর যে এত খারাপ লোক তা জানা ছিল না আমার। কিন্তু মধ্যাহ্নভোজটা কি তা হলে আজ উহ্য রাখতে হবে!

গিরিজাবাবু ফুঁসে উঠে বললেন, তার মানে! উহ্য রাখলেই হল? গাঁয়ের একটা মান-ইজ্জত নেই? বলি কেনারাম কী-ই বা খাওয়াত আপনাকে শুনি? মোটা চালের ভাত, পাতলা জলের মতো ডাল, পুঁটি মাছের ঝোল আর বড়জোর এক টুকরো লেবু।

এত খারাপ?

তবে আর বলছি কি। চলুন, আমর বাড়িতে চলুন। সরু

চালের ভাত, গাওয়া ঘি, বেগুন ভাজা, সোনা মুগের ডাল, মাছের মুড়ো, পাঁঠার মাংস, একবাটি পায়েস, চলবে তো?

কষ্টেসৃষ্টে চলে যাবে। তবে কিনা ডালের পাতে একটু ভাজাভুজি না হলে আমার চলে না।

খুব-খুব। গাছে বকফুল-কুমড়ো ফুল আছে। তাই দিয়ে বড়া। তারপর পটল আছে, কুমড়ো আছে, আর চাই কি আপনার? আসুন তো মশাই। লজ্জা করবেন না।

আহা, এত উতলা হবেন না। বেলাও বেশি হয়নি। মাত্র পৌনে বারোটা বাজে। মহাজনেরা কি বলেছেন জানেন তো! ভাবিয়া করিও কাজ, করিয়া ভাবিও না।

আহা, কান জুড়িয়ে গেল। মহাপুরুষরা যে কত ভালো ভালো কথা বলেন তার হিসেব নেই। তা করালীবাবু, কথাটা উঠল কেন?

না, ভাবছিলাম কেনারাম নস্করের মতো একজন কেষ্টবিষ্টু মানুষকে চটানোটা উচিত হবে কিনা।

কেষ্টুবিষ্টু! কেনারাম আবার কেষ্টবিষ্টু হল কবে?

এই যে কানাঘুষো শুনলুম তাঁর নাকি তিনতলা বাড়ি, বিরাট আমবাগান, তিনশো নারকোল গাছ, দুশো বিঘে ধানী জমি আর হিমঘর আছে।

ফোঁপরা মশাই ফোঁপরা। বেলুন দ্যাখেননি? লাল-নীল-সবুজ, দিব্যি নিটোল আকৃতি। হাওয়া বের করে দিলেই একটুখানি। কেনারামও তাই। ভালো করে খোঁজ নিয়ে দেখুন গে, সব মর্টগেজে বাঁধা আছে।

আপনি তো মুশকিলে ফেলে দিলেন মশাই। কেনারামবাবুর ছেলে সাতকড়ির সঙ্গে যে আমার মেয়ের বিয়েরও একটা প্রস্তাব

আজ সকালে দিয়ে বসলেন উনি!

বলেন কি? ওই গিদধরের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দেবেন? মাথা খারাপ হল নাকি আপনার? তার চেয়ে হাত-পা বেঁধে মেয়েকে জলে ফেলে দিন তাও ভালো।

তবে তো চিন্তার কথা হল মশাই!

তা তো বটেই। ভালো করে চিন্তা করুন। তবে বলে রাখি, মেয়ের বিয়ে দিতে চাইলে আমারও উপযুক্ত পুত্র আছে। বিএ পাশ, স্কুলের মাস্টার, দিব্যি কার্তিক ঠাকুরের মতো চেহারা।

সে তো বুঝলুম। কিন্তু আরও একটু কথা আছে।

কি বলুন তো।

কেনারামবাবু বললেন, এক পয়সা পণ নেবেন না, দানসামগ্রী দিতে হবে না, শুধু শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে বিয়ে দিলেই চলবে। শুনে তো আমার চোখে জল এল। এই কলিযুগেও এমন মানুষ আছে।

আছে মশাই আছে। কুমিরের চোখের জলকে বিশ্বাস করবেন না। কেনারাম নিশ্চয়ই অন্য মতলব এঁটে রেখেছে। আর পণের কথা বলছেন? পণকে তো আমি গো-মাংস বলে মনে করি। আর দানসামগ্রী! ছিঃ, ওসব কি ভদ্রলোকেরা নেয়?

গিরিজাবাবু আপনি আমাকে ছলনা করছেন না তো!

আরে না মশাই, না। কথা একেবারে পাকা। নড়চড় নেই। শুধু ওই কেনারামটার সঙ্গে মেলামেশা করবেন না যেন।

আজ্ঞে, সে আর বলতে! চলুন মধ্যাহ্নভোজটা সেরেই ফেলি। বেলা অনেক হয়েছে।

পরাণের ঘোড়া

ঘোড়ার মতো জিনিস হয় না। দেখতে যেমন বাহারে, ক্ষ্যামতাও তেমনি দশ মুখে বলার মতো। পরান সেই ছেলেবেলা থেকে ঘোড়া দেখে আসছে। তার বাবা গড়ান মণ্ডল ছিল শশীবাবুর অস্তাবলের ছোট সহিস। মস্ত জমিদার শশীবাবুর ভারি ঘোড়ার শখ। মেলা টাকা খরচ করে দিক-বিদিক থেকে ঘোড়া কিনে আনতেন। মোট এগারোখানা ঘোড়া ছিল তাঁর। দুঃখের বিষয় মোটা মানুষ বলে শশীবাবু ঘোড়ায় চাপতে পারতেন না। তাঁর ছিল দেখেই সুখ। পরাণেরও তাই। মাঝে মাঝে বাবার কাছে ঘোড়ায় চাপবার আবদার করত ঠিকই, কিন্তু বাপ গড়ান ভয় খেয়ে বলত, পাগল হয়েছিস! শশীবাবুর ঘোড়ার পিঠে তোকে চাপালে রক্ষে আছে? তদ্দণ্ডে আমার চাকরিটা যাবে।

সেই ইচ্ছে মনে মনে পুষে রেখেই বড় হল পরাণ। আর বড় হয়ে সে তার বাপের মতোই গরিব হল। পয়সা মোটেই হচ্ছিল না তার। তবে ঠিক করে রেখেছিল, পয়সা যদি কোনওদিন হয় তবে আর কিছু নয়, নিজের জন্য একটা ঘোড়া কিনবে।

তা ঘোড়া হল না পরাণের। গন্ধেশ্বর দাসের খেতে মজুর খেটে দিন গুজরান হয় তার। অসুরের মতো খাটুনি বটে, তবে পরাণ বিয়ে-থাওয়া করেনি বলে চলে যায়। এখন তার বাতিক

হয়েছে ছুটি হলেই কাগজ-কলম-পেন্সিল বা সস্তায় কেনা রঙের কাঠি দিয়ে ঘোড়ার ছবি আঁকা। আঁকা দেখেনি কারও কাছে। কিন্তু তাতে কি, কাউকে দেখানোর জন্য তো নয়, নিজের জন্যই সে অখণ্ড মন দিয়ে নানা ধরনের ভঙ্গিতে ঘোড়ার ছবি আঁকার চেষ্টা করে যায়। ওইটেই তার নেশা। ফুলবাড়ির হাটে একটা লোক মাঝে-মাঝে পটের ছবি বিক্রি করতে আসে। তার কাছে রং-তুলিও পাওয়া যায়। আর ছবি আঁকার ভূষো কাগজও। পয়সা খরচ করে সেই রং কিনে আনল একদিন। দেখল তুলি দিয়ে আঁকার আরও সুবিধে। প্রথমটায় মাপটাতে একটু অসুবিধে হয় বটে, তবে কিছুদিনের চেষ্টায় দেখল ব্যাপারটা মোটেই শক্ত নয়। সারাদিন খেতের কাজ করে সন্ধেবেলা এসে পরাণ ছবি আঁকতে বসে যায়। নিজে আঁকে, নিজেই দেখে। তারপর একটু-আধটু শুধরোতেও হয়।

ফুলবাড়ির হাটের পটুয়া হরিনাম তার ছবি আঁকার শখ দেখে বলল, চট বা ক্যানভাসে আঁকলে তা বহুদিন টিকবে, বলে কয়েকখানা ছবি আঁকার ছোট ক্যানভাস তাকে বেজায় সস্তাতেই দিয়ে দিল।

এদিকে গন্ধেশ্বর একদিন তাকে ডেকে বলল, দ্যাখ বাপু, তুই বেশ গায়ে-গতরে আছিস। আমি কেরামতের বাঁধের ধারের জমিটা রেজিস্ট্রি করতে গঞ্জে যাচ্ছি। সঙ্গে টাকা থাকবে। চলনদার হিসেবে তুই সঙ্গে যাবি। দিনকাল ভালো নয়।

রাজি না হয়ে উপায় কি? একখানা মজবুত লাঠি কাঁধে নিয়ে গন্ধেশ্বরকে পাহারা দিয়ে গঞ্জে নিয়ে যাচ্ছিল পরাণ, পীরপুর শ্মশানের ধারে যখন গরুর গাড়ি পৌঁছেছে তখনই আশপাশের

বাঁশঝাড় থেকে জনা পাঁচ-সাত লেঠেল ডাকাত বেরিয়ে এসে চড়াও হল।

পরাণ গায়ে-গতরে লম্বায়-চওড়ায় বেশ জোয়ান বটে তবে তেমন বীর নয়। জীবনে মারপিট করেনি। আদতে সে নিরীহ মানুষ। তাই ডাকাতদের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার সাধ্যই তার ছিল না। তবে আর কিছু না পারুক গন্ধেশ্বরকে সে আগলে রেখেছিল। বলেও ছিল, টাকার বটুয়াটা ছেড়ে দেন কর্তা। টাকা তো আর প্রাণের চেয়ে বড় নয়। কিন্তু গন্ধেশ্বরের কাছে তা নয়, টাকাই তার জানপ্রাণ। ফলে ধুমধাড়াক্কা লাঠিপেটা খেতে হল তাকে। গন্ধেশ্বরের চেয়েও পিটুনি অনেক বেশি খেতে হল পরাণকে। কাঁকালে চোট, মাথায় চোট, কনুইয়ের চোট।

কয়েক লহমায় লুটপাট সেরে ডাকাতরা হাওয়া হওয়ার পর গাঁয়ের লোক এসে তাদের জল-টল দেয়, নিয়ে গিয়ে দাওয়াতে বসায়। টাকার শোকে খুব কান্নাকাটি জুড়েছিল গন্ধেশ্বর। তারা নানা সান্ত্বনাবাক্যে তাকে ঠান্ডা করল। বাড়ি ফিরে গায়ের ব্যথা আর টাকার শোকে শয্যা নিল গন্ধেশ্বর। আর পরাণ রাত্তিরবেলাতেই তার লণ্ঠন জ্বেলে বসে গেল ছবি আঁকতে। তবে ঘোড়ার নয়, আজ যারা হামলা করেছিল তাদের মধ্যে দুজনের মুখ তার মনে গেঁথে আছে। ছবিতে মুখ দুটো ফোটানো যায় কিনা সেটাই দেখছিল পরাণ, এবং দেখল, ছবি দুটো প্রায় হুবহু হয়েছে।

ডাকসাইটে দারোগা অনাদি সরখেল ডাকাতির অদন্তে এসে গন্ধেশ্বর আর পরাণকে মেলা জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। চেহারার বর্ণনা চাওয়াতে পরাণ তার আঁকা ছবি দুটো এনে দেখাতেই দারোগাবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন, এ তো ধামাল আর ধানুকা! বিস্তর কেস আছে এদের নামে!

তিন দিনের মাথায় ডাকাতদের পাঁচ-সাত জন ধরা পড়লে গন্ধেশ্বরের তিন লাখ টাকার দু-লাখ উদ্ধারও হয়ে গেল। অনাদি সরখেল কঠিন মানুষ হলেও রসকষহীন নন। তিনি পরাণকে একদিন থানায় ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তুই কি ছবি আঁকিস নাকি?

পরাণ ছবি আঁকাটা অপরাধ কিনা বুঝতে না পেরে খুব ভয়ে ভয়ে বলল, ওই একটু-আধটু মকসো করি আর কি। মাপ করে দেন হুজুর।

অনাদি গম্ভীর গলায় বললেন, মাপ করার কিছু নেই। ছবি আঁকা খারাপ কাজ তো নয় রে আহাম্মক। তোর আঁকার হাত তো দিব্যি ভালো। কার কাছে শিখিস?

পরাণ হাত কচলে বলে, গরিব মানুষ হুজুর, কার কাছে শিখব? নিজের একটু-আধটু চেষ্টা করি।

হবিবপুরে সুধীরবাবুর সঙ্গে দেখা করিস। সমঝদার মানুষ। আমি বলে রাখবখন।

সুধীরবাবু তার আঁকা দেখে ভারি অবাক হয়ে বললেন, না শিখেই যা এঁকেছিস তাইতেই তো তাজ্জব হতে হয়। তা শুধু ঘোড়ার ছবি কেন রে? আর কিছু আঁকিস না?

আজ্ঞে আমার ছেলেবেলা থেকেই বড্ড ঘোড়ার শখ। আর ঘোড়ার জন্যই আঁকি। নইলে আঁকার তেমন ইচ্ছে আমার হয়নি কখনও।

তা আঁকার বিষয় হিসেবে ঘোড়াও কিছু খারাপ নয়। তবে অন্য বিষয়েও একটু আঁকিবুকি করলে ভালো হবে তোর। দুনিয়ায় ঘোড়া ছাড়াও কত কিছু আছে।

তা আছে। তবে পরাণের মনপ্রাণ জুড়ে কেবল ঘোড়াই

লাফিয়ে-দাপিয়ে বেড়ায়। তার সে অবাধ্য হল না। সুধীরবাবুর কাছে মাঝে মাঝে গিয়ে নানা বিষয়ে ছবি আঁকার তালিম নিতে লাগল।

একদিন গিয়ে দেখে সুধীরবাবুর বাড়ির সামনে একখানা চকচকে মোটরগাড়ি দাঁড়ানো। একজন বেশ বড়লোকি চেহারার ফর্সামতো মানুষ চেয়ারে বসা। আর সুধীরবাবু তাঁকে পরাণের ছবিগুলো দেখাচ্ছেন। তাকে দেখিয়ে সুধীরবাবু বললেন, এই এরই আঁকা। এর নাম পরাণ মণ্ডল। হাসির কথা হল এ ছেলেটার খুব ঘোড়ার শখ। পয়সা পেলে নাকি প্রথমেই একটা ঘোড়া কিনবে।

শুনে লোকটা একটু হাসল আর পরাণ খুব লজ্জা পেল।

লোকটা খানিকক্ষণ ছবিগুলো খুব মন দিয়ে দেখে হঠাৎ মুখ তুলে পরাণকেই জিগ্যেস করল, একটা ঘোড়ার দাম কত?

শুনে হাঁ করে রইল পরাণ। ঘোড়ার শখ তার আছে বটে, কিন্তু দরদাম সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। সে মাথা-টাথা চুলকে বলল, আজ্ঞে, সেসব তো জানা নেই।

লোকটা ফের হেসে বলল, ঘোড়া কিনলেই তো হবে না, তার দানাপানির জোগাড় চাই, অসুখ হলে চিকিৎসা করানো চাই। যত্ন-আত্তি চাই।

অতসব কি পরাণ জানে? সে শুধু জানে, ঘোড়া টগবগ করে ছোটে, চিঁহিঁ বলে লাফায়, চামরের মতো লেজে ঝাপটা মেরে বাহার দেখায়। সে বলল, যে আজ্ঞে।

তোমার পাঁচটা ছবি আমার পছন্দ হয়েছে। এই নাও দাম।

বলে লোকটা পরাণকে এক গোছা টাকা দিল, বেশ অনেক

টাকা। হাতে পেয়ে পরাণের হাঁ-মুখ আর বন্ধ হয় না। তার হাবিজাবি ছবিরও যে একটা দাম হতে পারে এ সে স্বপ্নেও ভাবেনি। সে হাতজোড় করে বলল, ও ছবি আপনি এমনিই নিয়ে যান, টাকা দিতে হবে না আজ্ঞে। এ যে অনেক টাকা।

লোকটা স্মিতমুখে বলে, টাকা পেয়ে ঘাবড়ে যেও না হে। তোমার অনেক টাকা হবে। তোমার ভিতরে যে মালমশলা আছে তা ভগবানের দেওয়া। দামটাও সেই জন্যই। সকলের কি আর ওসব মালমশলা থাকে?

তা পরাণের অবাক ভাবটা অনেকক্ষণ চেপে রইল তার ভোম্বল মাথায়। দুটো দিন কাজে কামাই দিয়ে উড়ু উড়ু মন নিয়ে মাঠে-ঘাটে ঘুরে বেড়াল সে। ব্যাপারটা এখনও সে তার বোকা মাথা দিয়ে ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না।

সুধীরবাবু তাকে ডেকে বললেন, মজুরবৃত্তি ছেড়ে দিয়ে ছবি নিয়ে পড়ে থাক। ওসব ছোট কাজের আর তো দরকার নেই তোর। ডালভাতের অভাব না হলেই হল।

কাজ ছাড়ার কথা বলতে যেতেই গন্ধেশ্বর হাউরে মাউরে করে তেড়ে এল, কাজ ছাড়বি মানে? ছাড়লেই হল? আমার তা হলে চলবে কী করে? আর তুই-ই বা খাবি কি?

পরাণ বলল, আজ্ঞে আমার অন্য উপায় হয়েছে। আর ভাত ছড়ালে কাকের অভাব হবে না, মজুর অনেক পাবেন।

গন্ধেশ্বর মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল। চোখে জল। বলল, তা জানি। কিন্তু তোর সঙ্গে যে আমি আমার মেয়ে ফুলির বে দেবো বলে ঠিক করে রেখেছি।

পরাণ তিন হাত পিছিয়ে গিয়ে জিব কেটে বলে, বিয়ে! ও

বাবা, ওর মধ্যে আমি নেই। বড় বউ ঝামেলার জিনিস। তার ওপর ফুলি। সে পয়সাওয়ালা বাপের আদুরে মেয়ে, আমাকে মানুষ বলেই গণ্য করবে না।

গন্ধেশ্বর হাপুস নয়নে বলে, তা তুই কি পাত্তর খারাপ! সেই যে ডাকাতের হাত থেকে আমার প্রাণরক্ষে করতে মার খেয়েছিলি সেই থেকে তোকেও এ-বাড়ির সকলের পছন্দ। ফুলিরও ভারি ইচ্ছে।

পরাণ সবেগে মাথা নেড়ে বলে, সে হয় না।

গন্ধেশ্বর ফুঁসে উঠে বলে, দারোগাবাবুরও ইচ্ছে।

পরাণ ভারি মুশকিলে পড়ে গেল। দারোগাবাবু অনাদি সরখেল ভারি ভালো চোখে দেখেন তাকে। তাঁর অবাধ্য হওয়াটা কাজের কথা নয়।

গন্ধেশ্বর বলল, ওরে শোন, বিয়েতে আমি তোকে একটা ভালো ঘোড়া কিনে দেবো বলে ঠিক করেই রেখেছি। তোর যে ভারি ঘোড়ার শখ সে কথা সবাই জানে কিনা।

পরাণ একটু হাঁ করে থেকে ঢোঁক গিলে বলল, তবে আর কথা কীসের?

তা পরাণের এখন বউ হয়েছে, একটা শাঁসালো শ্বশুরবাড়ি হয়েছে, বেশ কিছু টাকাও হয়েছে। তবে সবচেয়ে বড় কথা তার এখন একটা টগবগে, তেজী, দৌড়বাজ এবং দুষ্টু ঘোড়াও হয়েছে।

ছায়ার লড়াই

বিশ্বম্ভর রোগাভোগা নিরীহ মানুষ। ভারি ভীতুও বটে। তা সেই বিশ্বম্ভরের কাছে একদিন পোস্টকার্ডে খবর এল যে, তার এক দূরসম্পর্কের জ্যাঠা সম্প্রতি মারা গেছেন। নদিয়ার সাতপুরা গাঁয়ে তাঁর বসতবাড়ি আর জমিজমার হক বর্তেছে বিশ্বম্ভর বিশ্বাসের ওপর। সে যেন অতি সত্বর গিয়ে সম্পত্তির দখল নেয়, নইলে অন্য বন্দোবস্ত হবে।

বিশ্বম্ভরের অবস্থা এমনিতেই খারাপ, দিন আনি দিন খাই অবস্থা, রোজগারপাতি নেই। সামান্য জমিজমা যাও ছিল তা মহাজনের কাছে বাঁধা। ভাগ্য ভালো সে সংসারে সে একদম একা, সম্বল একখানা কুঁড়েঘর আর যৎসামান্য তৈজসপত্র।

সতুরাং চিঠিটা একরকম ভগবানের আশীর্বাদ **বলেই** তার মনে হল। তবে সাতপুরার জ্যাঠার কথা তার জানা ছিল না। পোস্টকার্ড পেয়েই প্রথম জানাল। প্রথমটা ভেবেছিল কেউ তার সঙ্গে রসিকতা করেই হয়তো চিঠিটা লিখেছে। তারপর বিবেচনা করে দেখল, তার মতো অধম মনিষ্যির সঙ্গে রসিকতা করার মতো লোকই বা কে আছে। আর পোস্টকার্ডে সাতপুরা ডাকঘরের ছাপও রয়েছে যখন, গিয়ে দেখে এলে হয়।

বিশ্বম্ভরের জিনিসপত্র বিশেষ নেই, যা ছিল তা পাশের বাড়ির জিম্মায় রেখে, দরজায় একটা তালা ঝুলিয়ে, পুঁটলি বগলে বেরিয়ে পড়ল। যা থাকে কপালে। সঙ্গে চেনা দেওয়ার প্রমাণপত্র হিসেবে ভোটের কার্ডখানা সম্বল।

সকলে বেরিয়ে সাতপুরায় পৌঁছোতে বিকেল গড়িয়ে গেল প্রায়। গাঁয়ের মোড়লমশাই তার পরিচয় পেয়ে খুব গম্ভীর হয়ে বললেন, তা হলে তুমিই নিবারণদাদার ভাইপো! আমি বাপু সাচ্চা লোক, বেঁচে থাকতে এ গাঁয়ে কোনও অধর্ম হতে দেবো না। তা যাও বাপু, নিজের জ্যাঠার সম্পত্তি বুঝে নাও গে। সঙ্গে লোক দিচ্ছি, সে বাড়ি চিনিয়ে দেবে।

বিশ্বম্ভর বাড়ি দেখে হাঁ, রাজপ্রাসাদ নয় বটে, কিন্তু তার মতো হাঘরে লোকের কাছে এত বড় পাকা বাড়ি প্রাসাদের কমও কিছু নয়। সঙ্গের লোকটা চাবি দিয়ে দরজা খুলে দিল, বলল, ব্যবস্থা সব ভালোই হে, আতান্তরে পড়বে না। যাও, ঢুকে পড়ো।

তা ঢুকেই পড়ল বিশ্বম্ভর। একতলা বাড়ি হলে কি হয়, গোটা চারেক বড় বড় ঘর, ভিতরে দরদালান, উঠোন, বাইরের দিকে চওড়া বারান্দা। বাগানও আছে বেশ বড়সড়। না হোক এক-দেড় বিঘে জমি।

ঘরে জিনিসপত্রের কোনও অভাব নেই। চৌকি আছে, খাট আছে, চেয়ার-টেবিল আছে, আলনা আছে, মেলা বাক্স-প্যাঁটরা আছে। রান্নাঘরে গিয়ে দেখল, গ্যাসের ব্যবস্থা আছে। চাল-ডালও পাওয়া গেল। উঠোনের পাতকুয়ো থেকে ঠান্ডা জল তুলে হাত-মুখ ধুয়ে চাট্টি চিঁড়ে ভিজিয়ে এ আকস্মিক সৌভাগ্যের কথা ভাবছিল। জ্যাঠার নাম নিবারণ বিশ্বাস। অনেক ভেবে তার মনে পড়ল, ছেলেবেলায় একজন পালোয়ানের মতো লোক মাঝে মাঝে তাদের গাঁয়ে আসত বটে।

যতদূর মনে পড়ে তাঁর নাম নিবারণ ছিল বটে।

গাঁয়ের দু-চারজন মাতব্বর মতো লোক এসে তার সঙ্গে দেখা করে গেল। সে ঠিক লোক কিনা তাও একটু যাচিয়ে দেখল।

বিশ্বম্ভর ভয়ে তটস্থ। যেন পানাপুকুর থেকে বড় গাঙে এসে পড়েছে।

একজন একটু ঠেস দিয়ে বলে গেল, নাঃ ভাইপো মোটেই নিবারণদার মতো হয়নি। নিবারণদা কত ডাকাবুকো মানুষ ছিল।

তা হবে। রাতে ডাল-ভাত রান্না করে খেয়ে সে একখানা হ্যারিকেন জ্বেলে শোওয়ার ঘরে এসে আরাম করে বসল। তার ভারি একটা আনন্দ হচ্ছে। রোজ সকালে উঠে পেটের চিন্তা করতে হবে না, ধার-বাকির খোঁজে হন্যে হয়ে ঘুরতে হবে না, উঞ্ছবৃত্তি বোধহয় এবার ঘুচল।

হঠাৎ একটু আঁতকে উঠল বিশ্বম্ভর। হ্যারিকেনের আলোয় সামনের দেওয়ালে একটা বেশ লম্বা-চওড়া লোকের ছায়া পড়ছে। লোকটা ডন দিচ্ছে হুপহাপ করে। বিশ্বম্ভর তো হাঁ। ই কি কাণ্ড রে বাবা! সিঁটিয়ে বসে সে দেখল লোকটা দুশো ডন দিয়ে উঠে নিজের হাত-পা-বুক দু-হাতে মালিশ করে নিয়ে ফের দুশো বৈঠকি দিল। বড় বড় শ্বাসের শব্দও শুনতে পাচ্ছে বিশ্বম্ভর। বৈঠক শেষ করে লোকটা হঠাৎ কুঁজো হয়ে দুই উরুতে থাবড়া মারতে মারতে বলে উঠল, চলে এসো।

সঙ্গে সঙ্গে দেয়ালের অন্য ধার থেকে একটা পেল্লায় চেহারার ছায়া এগিয়ে এল। তারপর দুই ছায়ায় কী কুস্তি। ধুন্ধুমার কাণ্ড যাকে বলে। এ ওকে তুলে আছাড় মারে, তো ও একে তুলে পটকে দেয়। দুইজনের হুমহাম শব্দে বাড়ি একেবারে সরগরম।

ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল ঠিকই, তবে বিশ্বম্ভরের কুস্তি দেখতে তেমন খারাপও লাগছিল না। কুস্তিতে যে কত রকমের প্যাঁচ-পয়জার আছে তা জানাও ছিল না তার। প্রথমটায় ভেবেছিল হ্যারিকেনটা নিবিয়ে দেবে। কিন্তু সেটা আর করেনি।

রাত প্রায় বারোটা অবধি কুস্তি করার পর দুই পালোয়ান ক্ষ্যান্ত দিল আর বিশ্বম্ভরও হ্যারিকেন কমিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন আবার একটু রাতের দিকে ওই কাণ্ড। দু-জন পালোয়ানের লড়াই। আজ আরও নতুন নতুন সব প্যাঁচ, নতুন ধরনের ল্যাং মারা, নতুন সব রদ্দা। বিশ্বম্ভর খুব মন দিয়ে দেখতে লাগল। ভয়-ডর উবে গেছে। বরং বেশ নেশাই হচ্ছে তার।

পরদিন বিশ্বম্ভর একেবারে কোণের ঘরে পালোয়ান জ্যাঠামশায়ের মুগুর, বারবেল, ডামবেল, ডন মারা খড়ম সব খুঁজে পেল। একটু লজ্জা-লজ্জা করছিল বটে, কিন্তু চট করে কয়েকটা ডন-বৈঠক দিয়ে নেওয়ার লোভও সামলাতে পারল না সে। তবে অনভ্যাসে হাড়গুলো সব মড়মড় করে উঠল। হাত-পা ভেরে এল। আর রাতে হল গায়ে প্রচণ্ড ব্যথা।

তবে দেয়ালে দুই পালোয়ানের ছায়ার কুস্তি রোজই রাতে চলতে লাগল। রোজই খুব মন দিয়ে দেখে বিশ্বম্ভর এবং সকালে আর বিকেলে রীতিমতো কোণের ঘরে গিয়ে ব্যায়াম করে।

কয়েকদিনের মধ্যেই তার খাওয়া দ্বিগুন, তিনগুন বেড়ে গেল। আর রোগা রোগা হাত-পায়েও যেন ডুমো ডুমো মাংস ফুটে উঠতে লাগল, বুক-খানাও যেন ঠেলে উঠল পালোয়ানদের মতো, গাঁয়ের লোক বলাবলি করতে লাগল, না হে, এ নিবারণদাদার উপযুক্ত ভাইপোই বটে।

এর পর যে ঘটনাটা ঘটল সেটা সাংঘাতিক। এক রাতে হঠাৎ প্রথম পালোয়ানের ছায়াটা তাকে ইশারা করে উঠে আসতে বলল। সে ভয়ে ভয়ে বিছানা ছেড়ে নামতেই ছায়াটা লাফিয়ে পড়ে তাকে সাপটে ধরে ল্যাং মেরে ফেলে দিল মেঝের ওপর।

কিন্তু বিশ্বম্ভর আর আগের মতো রোগা দুর্বল নয়, সেও লাফিয়ে উঠে পালটা প্যাঁচ কষে ছায়াটাকে লড়াই দিতে লাগল। ছায়াটা বলল, শাবাশ বিশে।

এইরকম রোজই হতে লাগল। আর হতে হতে বিশ্বম্ভর দিব্যি মুগুরের মতো হাত-পা বানিয়ে ফেলল, পেল্লায় বুকের ছাতি। গাঁসুদ্ধ লোক তাকে বাহবা দিয়ে বলল, তবে আর কি! নিবারণদাদা যাকে কোনওদিন হারাতে পারেননি সেই নবকুমার এবার লড়তে আসছে গাঁয়ে। যদি তাকে হারাতে পারে তা হলে খালু মহাজন দশ হাজার টাকা প্রাইজ দেবে।

শুনে তো বিশ্বম্ভর ভয়ে অস্থির। কিন্তু নিবারণ জ্যাঠার ছায়া অভয় দিয়ে বলল, নবকুমারের অস্ত্র হচ্ছে ওর পেল্লায় পেট। ওই পেট দিয়ে চেপে ধরেই ও সবাইকে হারায়। তুই ওর পেটটা এড়িয়ে চলিস, তা হলেই হবে।

লড়াইয়ের দিন গাঁ ভেঙে পড়ল আখড়ায়। বিকট গর্জন করতে করতে নবকুমার নেমে পড়ল আসরে। বিশ্বম্ভরকেও ঠেলে নামিয়ে দিলে গাঁয়ের মাতব্বররা।

প্রথমদিকে বিশ্বম্ভর বিশেষ সুবিধে করে উঠতে পারছিল না বটে। নবকুমারের গায়ে সাংঘাতিক জোর। প্যাঁচ-পয়জারও জানে ভালো। কিন্তু বিশ্বম্ভর একটু চালাকি করে হঠাৎ দূরে সরে গিয়ে তারপর ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো তেড়ে গিয়ে নবকুমারকে বিস্মিত করে তার পেটে একটা ঢুঁ মারল। কামানের গোলার মতো সেই ঢুঁ খেয়ে নবকুমার সেই যে চিৎপাত হল, তারপর উঠল তিন মিনিট বাদে। ততক্ষণে লড়াই শেষ।

বিশ্বম্ভরের জয়ধ্বনিতে সাতপুরায় তখন কান পাতা দায়।

বশীকরণ

বিষ্ণুপদর বাড়িতে পাখির খাঁচাও নেই, দাঁড়ও নেই। সোজা কথা হল বিষ্ণুপদ পাখি পোষে না, তবু তার বাড়িতেই পাখির আনাগোনা সবচেয়ে বেশি। সারা দিনমান তার বাড়িতে শালিক, চড়াই, কাক থেকে শুরু করে ময়না, টিয়া, ছাতারে, বুলবুলি, কাঠঠোকরা, বউ কথা কও। পাখির ভিড় দেখলে তাজ্জব লেগে যায়। বাড়ির ছাদে খোপে-খোপে অন্তত শতখানেক পায়রার বসত। সারাদিন পাখিদের কিচির মিচিরের চোটে কান ঝালাপালা।

বিষ্ণুপদ গরিব মানুষ। ভারি দীনদরিদ্র পৈত্রিক বাড়িতে সে থাকে। বাড়ি বলতে দুটো টিনের চালের ঘর আর বাঁশের বেড়া। উঠোনে একখানা ত্রিপল টাঙিয়ে তার পাঠশালা বসে। ওই ছাত্র পড়িয়েই তার যা কিছু সামান্য রোজগারপাতি হয়। ভারি কষ্টেই সংসার চলে তার। তার বউ কাত্যায়নী ভারি মুখরা আর দজ্জাল মহিলা। বিষ্ণুপদ তেমন রোজগেরে নয় বলে সারাদিন মুখ করে। বিষ্ণুপদ তেমন কথা-টথা কইতে জানে না, ঝগড়াঝাঁটি তার আসেই না। পাঠশালার সময়টুকু বাদ দিয়ে সে বাকি সময়টা পাখিদের সঙ্গেই কাটায়। দানাপানি দেয়, ঘুরে-ঘুরে পাখিদের খোঁজখবর নেয়। পাখিরাও তাকে বিলক্ষণ চেনে। উড়ে এসে তার ঘাড়ে, মাথায় বসে, হাত থেকে দানা খায়, পায়ের কাছেও ঘুরঘুর করে। মোটকথা বিষ্ণুপদকে পাখিরাও ভারি ভালোবাসে।

কাত্যায়নী যতই অপছন্দ করুক, গাঁয়ের লোক কিন্তু বিষ্ণুকে ভগবানের অংশ বলেই মনে করে। বনের পাখি যার কাছে বশ মেনেছে, সে যে সোজা লোক নয় তা লোকে বোঝে। তাই গরিব হলেও গাঁয়ে বিষ্ণুর একটু খাতির আছে।

তবে শচীন ঘোষ বিষ্ণুপদকে হাড়ে-হাড়ে অপছন্দ করে। শচীনের বড় ব্যবসা আছে, মেলা টাকা, আশপাশের পাঁচটা গাঁয়ে তার মতো পয়সাওয়ালা লোক আর নেই। তার প্রতিপত্তিও খুব। যত স্কুল আর কলেজের গভর্নিং বডির সে চেয়ারম্যান বা মেম্বার, পঞ্চায়েতের মাথা, সব সভাসমিতির একচেটিয়া সভাপতি। তার ভাষণ শুনে লোকে খুব হাততালি দেয়। কিন্তু সেই শচীন ঘোষেরও বিষ্ণুপদর মতো এলেম নেই। পাখি দূরে থাক, তার নিজের পোষা কুকুরটাও তার চেয়ে বনমালীর বেশি ভক্ত। আর বনমালী হল কিনা শচীনের চাকর। পাখিগুলোর কাণ্ডজ্ঞান নেই। কী দেখে যে ওরা বিষ্ণুপদর অত ন্যাওটা হল কে জানে!

তা শচীন ঘোষও আজকাল সকালে উঠে ভোর-ভোর কাকপক্ষীদের বাসি রুটি, মাছ-মাংসের টুকরো, পাখির দানা উঠোনে ছড়িয়ে খেতে দেয়, আর তা পাখিরা নেচে নেচে মহানন্দে খায়ও। তা বলে তারা এসে কিন্তু শচীনের কাঁধেও বসে না, পায়ের কাছে ঘুরঘুরও করে না।

দুঃখের কথাটা শচীন একদিন তার পেয়ারের চাকর বনমালীকে বলেও ফেলেছিল। শুনে বনমালী বলল, কর্তামশাই, ওসব হল মন্তর-তন্তরের ব্যাপার। বিষ্ণুপদকে ন্যাংটো বয়স থেকে দেখছি, মোটেই কোনও অবতার-টবতার নয়। গোপীবাবার কৃপায় যত ওর জারিজুরি।

গোপীবাবাটা আবার কে?

ফিরোজপুরের ডাকসাইটে তান্ত্রিক। তার গায়ে তো গোখরো, কেউটে দিনরাত বেয়ে বেয়ে উঠছে আর নামছে, বনের বাঘ এসে কমণ্ডলুর জল খেয়ে যায়, খ্যাপা ষাঁড় তেড়ে এসে গোপীবাবার সামনে হেঁটমুন্ডু হয়ে দাঁড়িয়ে চোখের জল ফেলে। মহাপুরুষ বললে বলতে হয় গোপী তান্ত্রিককে। বিষ্ণুপদ তো একসময় দিনরাত গোপীবাবার পদসেবা করত। গাঁজা সেজে দিত, জটার জট ছাড়াত, বিভূতি মাখাত।

শচীন সোৎসাহে বলে উঠল, বটে! তাহলে তো গোপীবাবার কাছেই যেতে হয়। লোকটার তো এলেম আছে দেখছি।

আজ্ঞে, এলেম বলবেন না, ওতে পাপ হয়। উনি সিদ্ধপুরুষ।

পরের শনিবার সন্ধেবেলাতেই ফিরোজপুরের শ্মশানের ধারে জঙ্গলে একটা বটগাছের তলায় গোপীবাবার আস্তানায় হাজির হয়ে গেল শচীন। সঙ্গে তার পেয়ারের চাকর বনমালী।

গোপীবাবা বুড়োমানুষ। পঞ্চমুন্ডির বেদীতে বসে সামনে ধুনি জ্বেলে ঘ্যাঁষ-ঘ্যাঁষ করে দাড়ি চুলকোচ্ছিল। চেলা-চামুণ্ডাও বিশেষ কেউ নেই। শুধু একটা রোগামতো লোক সামনে বসে গাঁজা সাজছে।

তাদের দেখে গোপীবাবা খ্যানখ্যানে গলায় হাঁক ছাড়ল, কে র‍্যা?

বনমালী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠে বলল, আজ্ঞে, ইনি হচ্ছেন গিয়ে শচীন ঘোষ। মস্ত মহাজন। এঁকে একটু কৃপা করতে হবে বাবা!

গোপীবাবা খ্যাঁক করে উঠল, কৃপা! কৃপা কি মাগনা নাকি?

আজ্ঞে না বাবা, শচীনবাবু মহাজন লোক।

শচীন গোপীবাবার গায়ে সাপখোপ দেখতে পাচ্ছিল না, জন্তু-জানোয়ারও নেই। একটু অবাক হয়ে বলে উঠল, ওরে বনমালী! গোপীবাবার গায়ে গোখরো সাপগুলো দেখছি না যে!

কথাটা কানে যেতেই গোপীবাবা তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠে রক্তাম্বর ঝাড়তে ঝাড়তে বিকটগলায় চেঁচাতে লাগল, সাপ! কোথায় সাপ, অ্যাঁ? ওরে, কোথায় সাপ? কামড়ে দেবে যে রে...!

চেঁচাতে চেঁচাতে বুড়ো শরীরে গোপীবাবা এমন তিড়িং-তিড়িং করে লাফাতে লাগল যে, না দেখলে বিশ্বাসই হত না কোনও খুনখুনে বুড়ো অমন লাফঝাঁফ দিতে পারে।

চেলাটাও গাঁজার কলকে ফেলে একটা গাছে উঠে পড়ে পরিত্রাহি চেঁচাচ্ছিল, মেরে ফেলল রে! মেরে ফেলল রে...।

শচীন রোষকষায়িত লোচনে বনমালীর দিকে চেয়ে বলে, এই তোর গোপীবাবার মহিমা? ছ্যাঃ-ছ্যাঃ! এ নাকি বিষ্ণুপদকে পক্ষীবিদ্যে শিখিয়েছে?

বিষ্ণুপদর নাম শুনে গোপীবাবা লাফঝাঁপ থামিয়ে আঁশটে মুখে বলল, কার কথা বলছ হে? অ্যাঁঃ! বিষ্ণুপদ নাকি? তাকে কত করে বললুম, ওরে তোকে হাজারটা টাকা দেব, আমাকে একটু পাখি বশ করার বিদ্যে শিখিয়ে দে। বুড়ো বয়সে একটু করে খাই। তা সে কী বলল জানো? বলল, ও বিদ্যে টাকা দিয়ে শেখা যায় না বাবা, ভালোবাসা লাগে। শোনো কথা! টাকা না হয় জোগাড় করা গেল, কিন্তু ভালোবাসা পাই কোথা বলো তো!

হতাশ হয়ে শচীন ফিরে এল। কিন্তু তার বাসনার কথা অনেকেই জানে। নবীন দাস এসে একদিন দুপুরে বলল, ও হে, বিষ্ণুপদর কথা ভাবছ তো! কিছু নয়। এই তো মাত্র দু-ক্রোশ দূরে রাঙামাটি গ্রাম। সেখানে রমেশ সামুই হল বশীকরণ বিদ্যের ওস্তাদ। পশুপাখি থেকে মানুষ যাকে বশ করতে চাও হেসে খেলে পারবে। বিষ্ণুপদ তো ওর কাছেই শিখেছে।

শচীন একদিন দুপুরবেলা গাড়ি হাঁকিয়ে রাঙামাটি গাঁয়ে বশীকরণবাজ রমেশ সামুইয়ের বাড়িতে হাজির হল। বাইরে সাইনবোর্ডও রয়েছে, এইখানে জ্যোতিষী, বশীকরণ, মারণ, উচাটন, বাণমারা, সম্মোহনবিদ্যা ইত্যাদি সযত্নে শেখানো হয়। দক্ষিণা নামমাত্র। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। তন্ত্রসিদ্ধ, কামাখ্যাফেরত, জ্যোতিষার্ণব শ্রীরমেশ সামুই।

একতলা জীর্ণ চেহারার বাড়িটা দেখে মোটেই ভক্তি হল না শচীনের। বাইরের বন্ধ দরজায় কড়া নাড়া দিল সে। কিন্তু শুনতে পেল ভিতরে এক প্রবল নারীকণ্ঠই কাকে যেন চিৎকার করে বাপান্ত করছে, ভণ্ড কোথাকার! জোচ্চোর! লোকের মাথায় কাঠাল ভেঙে খাস! তোর গলায় দড়ি জোটে না কেন রে? কত পুয়ে-পুয়ে দু-চারটাকা করে জমিয়ে ঘট ভরেছিলুম তার ওপরেও তোর শকুনের নজর! মর-মর...।

বাসন আছড়ে ফেলার ঝনঝন শব্দ শুনে আঁতকে উঠল শচীন। পিছন থেকে কে যেন বলল, কাকে খুঁজছেন আজ্ঞে?

শচীন তাকিয়ে দেখল, একটা রোগা মতো লোক ফোকলা মুখে একটু হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

শচীন বলে, এই রমেশবাবুর কাছেই এসেছিলাম আর কি!

শ্রীরমেশ আমুই
বশীকরন, মারন, বানমারা, জ্যোতিষী
দক্ষিনা নামমাত্র
তন্ত্রসিদ্ধ, কামাখ্যাপেরত, জ্যোতির্ষানব

তবে ঘণ্টাটাক দাঁড়াতে হবে। ওদের স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া হচ্ছে কিনা। একবার লাগলে ঘণ্টাখানেকের আগে থামে না।

কিন্তু এই যে শুনলুম উনি বশীকরণের ওস্তাদ?

সে আমরাও শুনেছি। কিন্তু কেউ কখনও নিজের বউকে বশীকরণ করতে পেরেছে কি?

উনি তো বাণ-টানও মারেন দেখছি! তাতে কাজ হয়?

তা কি আর হয় না? নিশ্চয়ই হয়। তবে একটু সময় লাগে, এই যা।

সেটা আবার কীরকম?

এই ধরুন, আজ হয়তো একজনকে বাণ মারল, তাতে সে হয়তো মরল গিয়ে আশি বছর পর। সেটাও কি কম কথা?

ভারি হতাশ হয়ে ফিরে এল শচীন। দেশটা কি জালি লোকে ভরে গেল?

অবশেষে কানাই মণ্ডল হদিস দিয়ে বলল, ওহে, তুমি একবার জরিবুটিওয়ালা নজর আলির কাছে যাও। এই তো তিন ক্রোশ দূরে দাশুরহাট। যাকে জিগ্যেস করবে বলে দেবে।

তাও গেল শচীন। নজর আলি খুব বাবু মানুষ। দাড়িতে মেহেন্দি, চুলে বাবরি, চোখে সূর্মা, গা থেকে আতরের গন্ধ ছড়াচ্ছে। গায়ে চিকনের কাজ করা পাঞ্জাবি, পরনে চেক লুঙ্গি। উঠোনে খাটিয়ায় বসে পোষা পায়রাদের দানা খাওয়াচ্ছিল।

শচীনের আবদার শুনে দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, সে আর বেশি কথা কি? কাজ হয়ে যাবে। একটা মলম দিচ্ছি, সারা গায়ে লাগিয়ে বাইরে বসে থেকো। আড়াইশো টাকা দাম।

ছোট প্যাকেটে মলম নিয়ে বাড়ি ফিরল শচীন। মনে ভারি ফূর্তি।

পরদিন সকালেই মলম লাগাল সারা গায়ে। গন্ধটা একটু বিটকেল আর ভারি আঠালো। উঠোনে একটা জলচৌকি পেতে বসতেই আশ্চর্য কাজ হতে লাগল।

কোথা থেকে হুস করে একটা কাক এসে প্রথমেই তার বাঁ কাঁধে বসে তারস্বরে 'কা-কা' বলে চেঁচাতে লাগল। একটু বাদেই ডান কাঁধে এসে বসল পেল্লায় সাইজের চিল। বসেই সে রাম ঠোক্কর দিতে শুরু করল শচীনের মাথায়। গোটা দুই শালিক এসে বাঁ-হাতে বসেই রীতিমতো ঝগড়াঝাঁটি করতে লাগল। আর ডান হাতে এসে বসল একটা ঘুঘু। মুশকিল হল, পাখিগুলো যে এসে বসল, আর উড়ে যাবার নাম নেই। ফলে শচীনের প্রাণান্তকর অবস্থা!

কাকের কা কা চিৎকার এবং ঠোক্কর, চিলের নখে কাঁধে ক্ষত, ঠোক্করে মাথায় রক্তপাত, শালিক আর ঘুঘুর চেঁচামেচি সব মিলিয়ে শচীন যায়-যায়।

সে উঠে যন্ত্রণায় লাফাতে লাফাতে চেঁচাতে লাগল, ওরে! তোরা কে কোথায় আছিস! আমাকে রক্ষে কর এসে...!

লোকজন দৌড়ে এসে পাখিদের টানাহেঁচড়া করে ছাড়িয়ে উড়িয়ে দিল। তারপর গায়ে আঠা ছাড়াতে দু-ঘণ্টা পুকুরে চোবানো হল শচীনকে। ঝামা ঘষে গায়ের আঠা তুলতে হল।

অবশেষে দিন সাতেক বাদে সে গিয়ে গুটি-গুটি বিষ্ণুপদর বাড়িতে হাজির হয়ে খুব নরম গলায় বলল, বাপ্ হে বিষ্ণুপদ। তোমাকে গুরু বলে মানছি। বিদ্যেটা আমাকে শেখাবে?

বিষ্ণু অবাক হয়ে বলে, বিদ্যে তো কিছু জানিনে মশাই। আমি শুধু ভালোবাসতে জানি।

শচীন ভারি ভাবনায় পড়ল। বিদ্যে-টিদ্যে শেখা বরং সহজ। কিন্তু ভালোবাসা! সেটা কি বেজায় শক্ত জিনিস নয়? তা কী আর করা যাবে! সে বলল, তবে তাই শেখাও বাপু। রোজ এসে তোমার কাছে বসে ওইটেই না হয় শিখব।

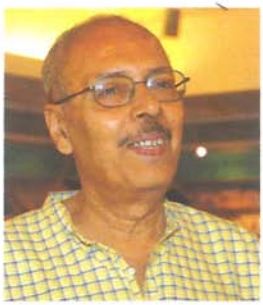

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ২ নভেম্বর, ১৯৩৫, ময়মনসিংহ-এ। শৈশব কেটেছে নানা জায়গায়। পিতা রেলের চাকুরে। সেই সূত্রে এক যাযাবর জীবন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কলকাতায়। এরপর বিহার, উত্তরবাংলা, পূর্ববাংলা, আসাম। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় কুচবিহার। মিশনারি স্কুল ও বোর্ডিং-এর জীবন। ভিকটোরিয়া কলেজ থেকে আই. এ.। কলকাতার কলেজ থেকে বি. এ.। স্নাতকোত্তর পড়াশোনা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথম উপন্যাস 'ঘুণপোকা'। প্রথম কিশোর উপন্যাস—'মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি'। কিশোর সাহিত্যে শ্রেষ্ঠত্বের স্বীকৃতিরূপে ১৯৮৫ সালে পেয়েছেন বিদ্যাসাগর পুরস্কার। পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার ও ১৯৮৯ সালের সাহিত্য অকাদেমি পুরস্কার।

পত্র ভারতী প্রকাশিত বই

ঝুড়ি কুড়ি গল্প, ভ্রমণ সমগ্র, শীর্ষেন্দু। বিন্দু থেকে সিন্ধু, ময়নাগড়ের বৃত্তান্ত, শীর্ষেন্দুর সেরা ১০১, রূপ- মারীচ রহস্য, ভৌতিক গল্প সমগ্র এবং পাঁচটি উপন্যাস।

প্রচ্ছদ রোচিষ্ণু সান্যাল

INR 150.00

9 788183 741811

www.bookspatrabharati.com